Litu Brittanto by Md. Jafar Iqbal

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

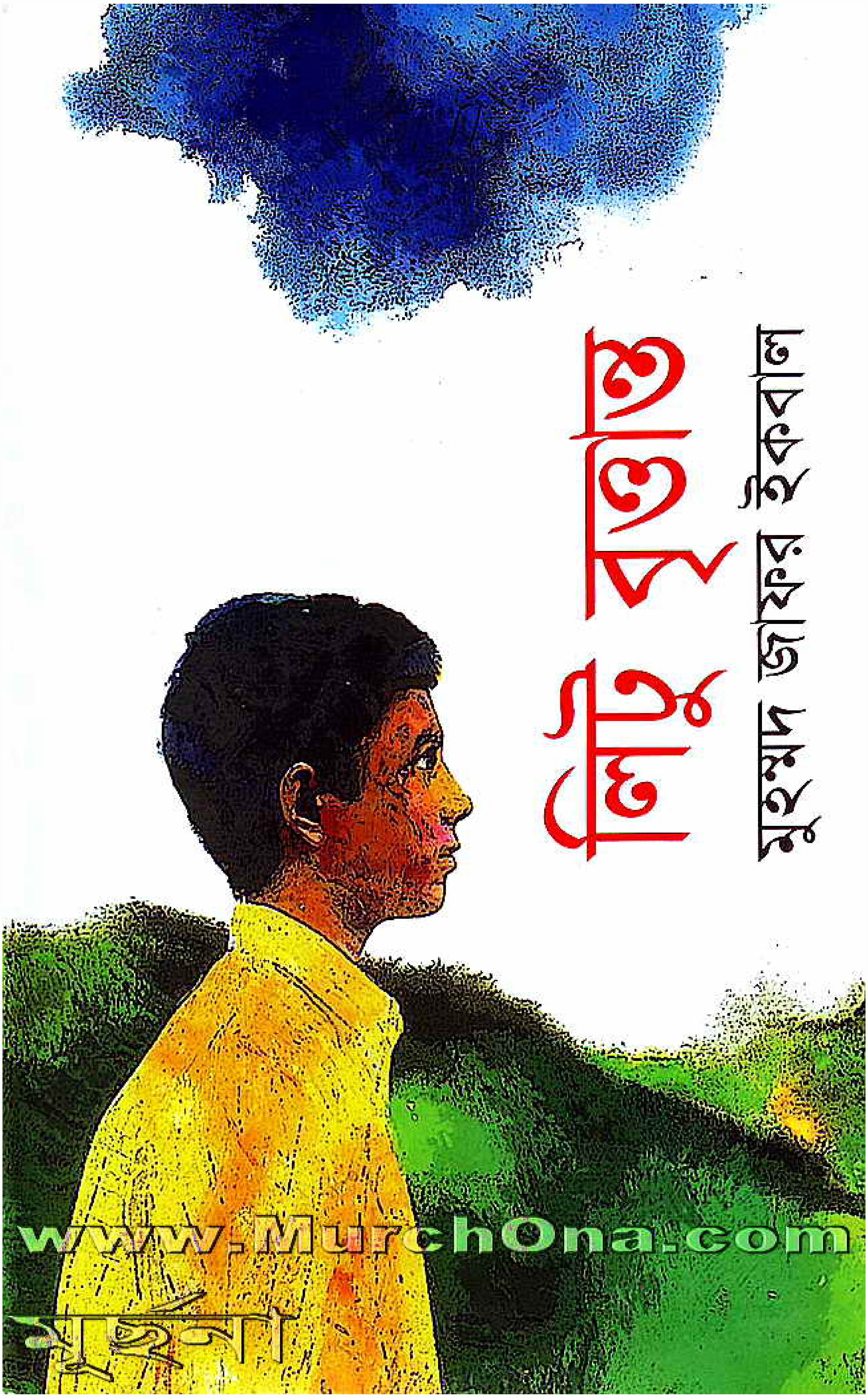
লিটু বৃত্তান্ত
মুহম্মদ জাফর ইকবাল
www.MurchOna.com
মূর্ছনা

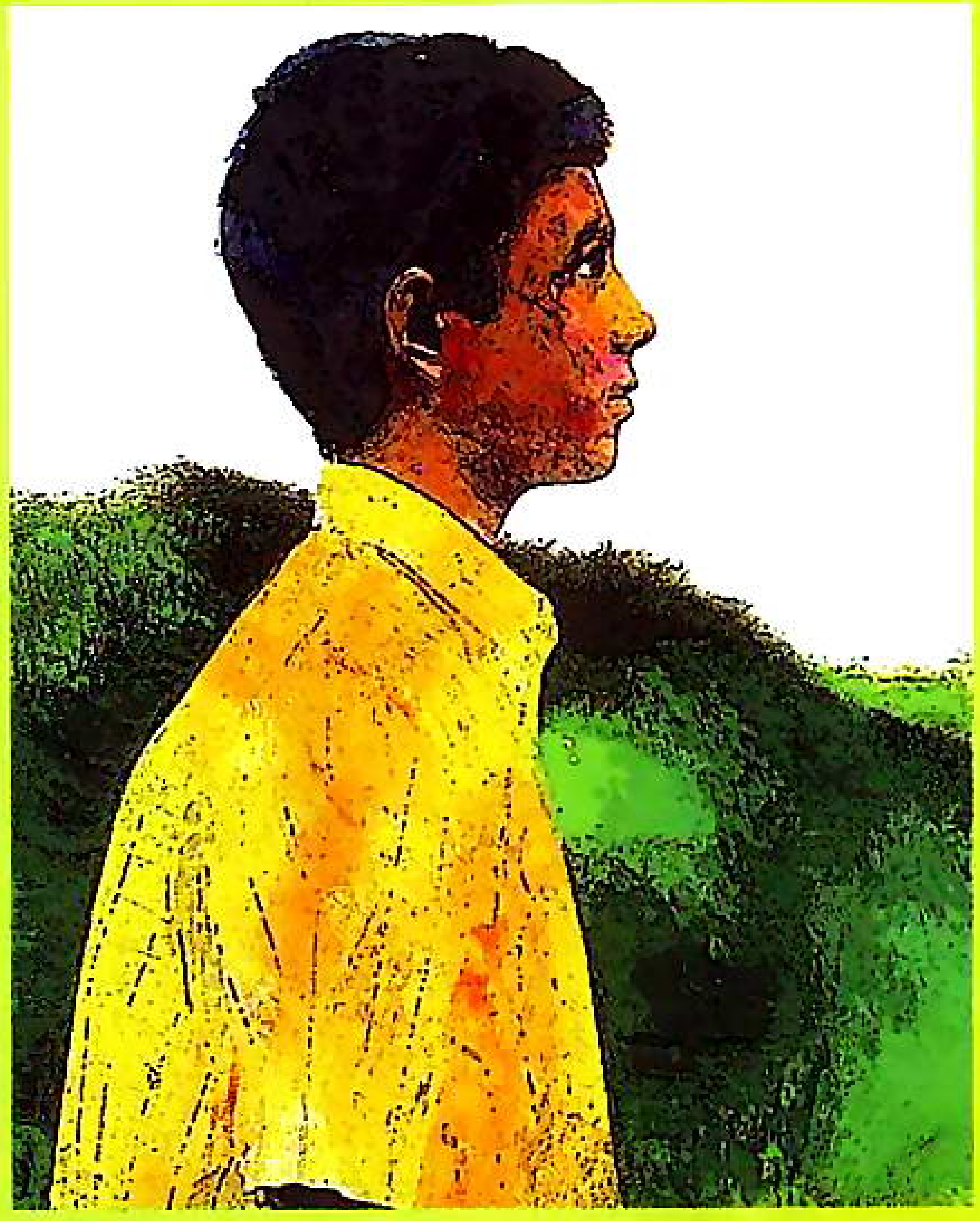

'লিটু বৃত্তান্ত' লিটুর একার গল্প না,
লিটু এবং আরো অনেকের গল্প।
যেমন লিটুর স্কুলের বন্ধুরা-
আধা পাগল রতন, ভাল ছাত্র সাদিব
পরী মাধুরী, মারদাঙ্গা সুমন আর
তানিয়া-মাদার টেনিয়া...

আর আছেন লিটুর রিয়াজ মামা-
একেবারে ফাটাফাটি ধরনের বিজ্ঞানী ...
আর আছে ভয়ংকর বদি ডাকাত-
হাওরে তার খপ্পরে পড়ে লিটুরা ...
আর আছেন একজন মুক্তিযোদ্ধা-
সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা!
মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনান তিনি লিটুদের ...

সকলকে নিয়ে জমজমাট অ্যাডভেনচার,
বন্ধুতা আর দেশকে ভালোবাসার এক
আশ্চর্য কাহিনী ...

১.

রাত্রিবেলা আমরা সবাই খেতে বসেছি, আব্বু প্লেটে ভাত নিতে নিতে বললেন, "আজকে একটা ভালো খবর আরেকটা খারাপ খবর আছে। কোনটা আগে শুনতে চাস?"

আমি চিৎকার করে বললাম, "ভালো খবর! ভালো খবর!"

রাজু আমার থেকে চার বছরের ছোট, সে হচ্ছে গাধা টাইপের—আমি যেটা বলি সেও সবসময়ে সেটা বলে। তাই সেও চ্যাঁচাতে লাগল, "ভালো খবর! ভালো খবর!"

আপু আমার থেকে তিন বছরের বড়, এই বছর কলেজে ভর্তি হয়েছে। ঢাকায় হোস্টেলে থাকে। সে একটু আঁতেল টাইপের। সবাই যেটা বলে আপু সব সময় তার উল্টোটা বলে, তাই আজকেও উল্টোটা বলল। আঙুল দিয়ে খুব কায়দা করে চশমাটা নাকের কাছে ঠেলে দিয়ে বলল, "উহুঁ উহুঁ! আগে শুনতে চাই খারাপটা। আগে যদি আমরা খারাপটা শুনি তাহলে পরে যখন ভালোটা শুনব সেটাকে আরো বেশি ভালো শুনাবে। এইটা হচ্ছে অনেকটা থিওরি অফ রিলেটিভিটির মতন—"

এই হচ্ছে আপুর এক নম্বর সমস্যা– কঠিন কঠিন জিনিস ছাড়া কথা বলতে পারে না। আব্বু অবশ্যি আপুর কথাটা শুনলেন না, বললেন, "নাহ্! ভালোটাই আগে বলি।" তারপর চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললেন, "আমার প্রমোশন হয়েছে। আমি এখন ফুল প্রফেসর। তোদের সামনে যে মানুষটা বসে আছে সে হচ্ছে প্রফেসর ডক্টর আবুল কালাম।"

আমরা অনেকদিন থেকে শুনছিলাম আব্বুর প্রমোশন হবে, কিন্তু সেটা হয়ে হয়েও হচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত সেটা হয়ে গেছে শুনে আমরা আনন্দে চিৎকার করতে থাকলাম। আপু পর্যন্ত তার আঁতেল ভাবটা ভুলে গিয়ে আমার আর রাজুর মতন "ইয়া ইয়া ইয়া" করে চ্যাঁচাতে লাগল। আম্মু শেষপর্যন্ত বললেন, "ব্যাস! ব্যাস!

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

অনেক হয়েছে। এখন থাম। বাসায় ডাকাত পড়েছে মনে করে না হয় পুলিশ চলে আসবে।"

রাজু গাধা টাইপের, তাই সে জিজ্ঞেস করল, "আব্বু, এখন তুমি কত টাকা বেতন পাবে? আমাকে এখন একটা কম্পিউটার কিনে দেবে?"

আব্বু বললেন, "না রে! বেতন বেশি বাড়ে নাই। অনেকদিন থেকে তো প্রমোশন আটকে ছিল তাই বেতন যেটা বাড়ার সেটা আগেই বেড়ে গিয়েছিল!"

রাজু ঠোঁট উল্টে বলল, "তাহলে প্রমোশন হয়ে কী লাভ?

আমি বললাম,"গাধা! যেটা বুঝিস না সেটা নিয়ে কথা বলিস না!"

আপু তার চশমাটা আরেকবার নাকের কাছে ঠেলে দিয়ে বলল, "আব্বু তুমি এখনো আমাদেরকে খারাপ খবরটা বল নাই।"

আব্বু বললেন, "আর খারাপ খবরটা হচ্ছে প্রমোশনের সাথে সাথে আমি বদলী হয়েছি। আমি এখন প্রিন্সিপাল এইচ. কিউ. গভমেন্ট কলেজ..."

"বদলী?" আমার মুখটা হা হয়ে গেল, "বদলী মানে?"

আপু ধমকে দিয়ে বলল, "বদলী মানে জানিস না? এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া।"

"আমি সেটা জানি! কিন্তু..."

"কিন্তু কী?"

আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। এখানে আমার স্কুল, এতদিনের বন্ধু বান্ধব সবাইকে ছেড়ে-ছুড়ে চলে যেতে হবে? নূতন জায়গায় গিয়ে নূতন স্কুল, নূতন স্যার, নূতন ম্যাডাম ছাত্র-ছাত্রী নূতন বন্ধু-বান্ধব? কী সর্বনাশ!"

আপু বলল, "আব্বু! তুমি এটাকে খারাপ খবর বলছ কেন? এটা তো আরো বেশি ভালো খবর! সবাই মিলে নূতন জায়গায় যাব। সেখানে নূতন পরিবেশ নূতন বন্ধু-বান্ধব..."

আপু তার আঁতেল স্টাইলে বড় বড় কথা বলতে লাগল—কী বলছে না বলছে আমি ভালো করে শুনতেও পেলাম না। আমার মাথা ততক্ষণে চক্কর মারতে শুরু করেছে। এইখানে আমার সব বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে কত কী করছি, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে? সাফকাতকে নিয়ে একটা লাইব্রেরি বানিয়েছি। জাহিদের সাথে একটা ল্যাবরেটরি। কাজল, মতিন, সজীব সবাইকে নিয়ে একটা ক্রিকেট ক্লাব। সোনিয়া আর সলীলকে নিয়ে ক্লাশে একটা ওয়াল ম্যাগাজিন বের করার কথা। কাউকে বলা যাবে না সেইরকম দুইটা প্রজেক্ট আছে, সেই প্রজেক্টগুলোর কী হবে? আমি একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে গেলাম, আব্বুর দিকে তাকিয়ে

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

বললাম, "আব্বু তোমার বদলী না হলে হয় না?"

"উহুঁ।" আব্বু একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললেন, "নূতন একটা কলেজে প্রিন্সিপাল করে বদলী করেছে—আমাকে যেতেই হবে রে!"

"কিন্তু—কিন্তু—" আমি কথাটা শুরু করে শেষ করতে পারলাম না।

আপু আমার দিকে তাকিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, "লিটু! তুই তো দেখি মহা সেলফিস মানুষ! এতদিন পর আব্বুর প্রমোশনটা হলো এখন সবাইকে নিয়ে নূতন জায়গায় যাবেন, সেটা নিয়ে খুশি হওয়ার কথা—আর তুই ঘ্যান ঘ্যান করছিস?"

আমি রেগেমেগে বললাম, "তোমার জন্যে বলা খুব সোজা। থাক ঢাকায় হোস্টেলে, সব বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এক জায়গায়। আমার মতন সবাইকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে নাকি?"

আপু সরু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ব্যাপারটা কী? লিটু এরকম খেপে যাচ্ছে কেন? গার্লফ্রেন্ড হয়েছে নাকি?"

আমার ইচ্ছে হলো আপুর গলা টিপে ধরি কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো সেটা করা যায় না। মেয়েরা যে কত ডেঞ্জারাস সেটা তো আপুকে দেখেই বোঝা উচিত, তার যন্ত্রণায় আমার জীবন শেষ হবার অবস্থা আর আমার হবে গার্লফ্রেন্ড?

রাজু—আমাদের গাধা নম্বর ওয়ান, দাঁত বের করে হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, "হয়েছে! আপু হয়েছে! আমি দেখেছি ভাইয়া সোনিয়া আপুর সাথে সাথে কথা বলছে। গার্লফ্রেন্ড! গার্লফ্রেন্ড!!"

আম্মু আর আব্বু সামনে না থাকলে আমি নির্ঘাত রাজুর নাকে একটা ঘুষি লাগাতাম। এই গাধাটার মাথায় কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি নাই কোনোদিন হবে বলেও মনে হয় না। আমি চোখ লাল করে রাজুর দিকে তাকিয়ে একবার দাঁত কিড়মিড় করলাম। চোখ থেকে আগুন বের হবার কোনো সিস্টেম থাকলে এই গাধাটা পুড়ে এতক্ষণে কাবাব হয়ে যেত।

শুধু আম্মু আমার মনের অবস্থাটা একটু বুঝতে পারলেন, আমার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, "লিটু বাবা, তুই এত আপসেট হচ্ছিস কেন? দেখিস নূতন জায়গায় গিয়ে তোর কত ভালো লাগবে। বড় শহরে থেকে কোনো আনন্দ নেই। যেখানে যাচ্ছি সেটা হাওর এলাকা। বর্ষা কালে দেখবি কী সুন্দর, চারিদিকে শুধু পানি আর পানি!"

"আর এই খানে আমার সব বন্ধুরা?" কথাটা বলতে গিয়ে আমার চোখে প্রায় পানি এসে যাচ্ছিল।

আপু বললেন, "তারা তো থাকলই। ছেলেবেলার বন্ধু হচ্ছে সারা জীবনের

www.MurchOna.com

বন্ধু। তারা তোর কাছে বেড়াতে আসবে তুই তাদের কাছে বেড়াতে যাবি। নূতন জায়গায় যাচ্ছিস তোর নূতন বন্ধু হবে।"

রাজু হাততালি দিয়ে বলল, "গার্লফ্রেন্ড! গার্লফ্রেন্ড!"

আমি আর পারলাম না, চোখ পাকিয়ে বললাম, "আর একবার বলবি তো ঘুষি মেরে তোর নাক ভেঙে ফেলব।"

আব্বু বললেন, "লিটু! এটা কী রকম কথা? বড় হয়ে তুই ডাকাত হবি নাকি?"

আমি কিছু বললাম না কিন্তু আমার মনে হলো বড় হয়ে ডাকাত হওয়াটাই আমার কপালে আছে! সবাইকে ছেড়ে-ছুড়ে একদিন ডাকাত হয়ে যাব, আমার নাম হবে লিউট্যা ডাকাইত!

নূতন জায়গায় গেলে কী কী মজা হতে পারে সেটা নিয়ে খাবার টেবিলে সবাই কথা বলতে লাগল। ঠিক কী কারণ জানি না প্রত্যেকটা কথাই আমার শরীরে গরম তেলের ছিটের মতো লাগতে লাগল। আমি কথাগুলো না শুনে চুপচাপ খাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম—গলার মাঝে ঢেলার মতো কী যেন অটকে আছে, যেটাই খেতে চাই না কেন কোনোটাই গলা দিয়ে নামতে চায় না।

আসলে আমার কপালটাই খারাপ। অন্য সবার কপালেই যে-রকম কিছু খারাপ জিনিস আছে সেরকম ভালো জিনিসও আছে—আমার বেলা কোনো ভালো জিনিস নাই, সব খারাপ। অন্যদের যদি চিকেন পক্স হয় দেখা যায় চিকেন পক্স ভালো হবার পর ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়ে গেছে। রিক্সা থেকে পড়ে কব্জি ভেঙে গেলে লটারীতে মোবাইল ফোন পেয়ে যায়। আমার যদি চিকেন পক্স হয় সেটা ভালো হবার সাথে সাথে রিক্সা থেকে পড়ে কব্জি ভেঙে যাবে। সেই ভাঙা কব্জি জোড়া লাগার সাথে সাথে প্রাণের বন্ধুর সাথে ঝগড়া হয়ে যাবে। সেই ঝগড়া মিটমাট হওয়ার সাথে সাথে রাক্ষুসী ম্যাডাম হয়ে যাবে ক্লাশ টিচার। রাক্ষুসী ম্যাডামকে ম্যানেজ করে বন্ধুদের নিয়ে একটা ফাটাফাটি প্ল্যান করা মাত্রই গহীন জঙ্গলে বদলী হয়ে যাব। আমি একেবারে লিখে দিতে পারি এই গহীন জঙ্গলে নিশ্চয়ই বাঘ সিংহ আমাকে খেয়ে ফেলবে। বাঘ সিংহ যদি নাও খায় আমি নির্ঘাত হাওরের পানিতে ডুবে মরব। পানি খেয়ে পেট ঢোল হয়ে ফুলে থাকবে আর আমি উপুড় হয়ে পানিতে ভেসে থাকব। খোদার নিশ্চয়ই কপালে লেখার জন্যে আলাদা আলাদা কলম আছে। ভালো জিনিস লেখার জন্যে একটা কলম, খারাপ জিনিস লেখার জন্যে আরেকটা কলম। আমার কপালে খোদা যখন ভালো-মন্দ লিখতে শুরু করেছিলেন তখন নিশ্চয়ই ভালো জিনিস লেখার কলমটার কালি শেষ হয়ে

www.MurchOna.com

গিয়েছিল। খোদা তখন খারাপ জিনিস লেখার কলম দিয়েই লিখে লিখে আমার কপালটা ভরে দিয়েছিলেন। কলমের নিব নিশ্চয়ই খুব চিকন, তা না হলে আমার এই টুকুন ছোট কপালে খোদা এত এত খারাপ জিনিস কেমন করে লিখলেন?

নূতন জায়গায় যাবার জন্যে সবকিছু ঠিকঠাক করা হচ্ছিল, তবুও আমি মনে মনে আশা করছিলাম যে হয়তো একেবারে শেষ মুহূর্তে আব্বুর প্রমোশনটা বহাল থাকবে কিন্তু বদলীটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে। আমাদের আর যেতে হবে না—কিন্তু সেটা হলো না। আমার অবশ্যি আগেই সেটা আন্দাজ করা উচিত ছিল, আমি যেটা চাই কখনোই সেটা হয় না। সবসময় হয় তার উল্টোটা।

দেখতে দেখতে বদলীর দিনটা এগিয়ে আসতে লাগল। প্রথমে ফার্নিচারগুলো ট্রাকে করে পাঠানো হলো, তার সাথে কার্টনে বোঝাই করে বই। আমাদের বাসায় যে এত বই ছিল সেটা আমরা আগে কখনো টের পাই নাই। রান্নাঘরের হাড়ি-পাতিল বাক্সে আর জামা-কাপড় স্যুটকেসে বোঝাই করা শুরু হলো। পুরো বাসা ওলটপালট হয়ে যাবার কারণে অনেক হারিয়ে যাওয়া জিনিস আমরা খুঁজে পেলাম। শুধুমাত্র সোফার সিটের নিচ থেকেই আধ ডজন বল-পয়েন্ট কলম আর বেশ কিছু খুচরা টাকা বের হয়ে এলো। আমার একটা হর্স স্যু ম্যাগনেট হারিয়ে গিয়েছিল শোয়ার ঘরের বিছানার নিচে সেটাকে পাওয়া গেল। আব্বু আবিষ্কার করলেন তার অনেক দরকারি কাগজপত্র ইঁদুরে কেটে কুটি কুটি করে ফেলেছে। সাফকাতের সাথে আমি যে লাইব্রেরিটা তৈরি করেছিলাম তার অর্ধেক বই সাফকাত আমাকে দিতে চাইছিল, আমি আর নিলাম না। জাহিদের সাথে যে ল্যাবরেটরি তৈরি করেছিলাম সেই জিনিসগুলো অবশ্যি আমরা ভাগাভাগি করে নিলাম—সেগুলো অনেক কষ্ট করে জোগাড় করতে হয়েছিল। কাজল, মতিন, সজীব আর অন্য সবাই মিলে আমাকে একটা ক্রিকেট ব্যাট কিনে দিল। সলীল সোনিয়া আর ক্লাশের অন্য মেয়েরা আমাকে অনেকগুলো গল্পের বই কিনে দিল। ঠিক যেদিন যাব তার আগের দিন আমি সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম, মতিনের মনটা খুব নরম সে তো বিদায় দিতে গিয়ে কেঁদেই ফেলল। অন্যদের চোখ ছলছল করছিল কিন্তু আমরা সবাই ভাব করতে লাগলাম এভাবে চলে যাওয়াটা আসলে কোনো ব্যাপারই না।

আমরা যেদিন রওনা দিব সেদিন সকালে উঠে বাসাটাকে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। পুরো বাসাটা খালি, জানালায় পর্দা পর্যন্ত নেই—দেখে মনেই হয় না যে এই বাসাতে আমরা কত বছর কাটিয়েছি! দুপুর বেলা আমরা ভাড়া করা

www.MurchOna.com

মাইক্রোবাসে করে স্টেশনে এসেছি। ট্রেনে একটা ফাস্ট ক্লাশ কেবিন আমাদের জন্যে রিজার্ভ করে রাখা ছিল। কোথাও বেড়াতে যাবার সময় এরকম হলে কী মজাটাই না হতো কিন্তু আজ আমার কিছুই ভালো লাগছিল না। মোটামুটি সময় মতো ট্রেনটা ছেড়ে দিল। প্রায় সারাটা দিনই ট্রেনে কাটিয়ে দিলাম, সন্ধ্যেবেলা ট্রেন থেকে নেমে বাসে। বাস যখন আমাদের ছোট শহরটায় পৌঁছেছে তখন অনেক রাত, ঘুমে তখন আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। আম্মু টিফিন ক্যারিয়ার থেকে পরাটা আর কাবাব বের করে দিলেন। ঘুম ঘুম চোখে কীভাবে কীভাবে সেগুলো খেয়ে সাথে সাথে ঘুমিয়ে গেলাম। কোথায় ঘুমিয়েছি সেটাও ভালো করে জানি না, মনে হয় মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে কেউ আগে থেকে বিছানা তৈরি করে রেখেছিল।

খুব ভোর বেলা বিচিত্র এক ধরনের শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। আমি ঘুম থেকে উঠে বুঝতেই পারছিলাম না আমি কোথায় আছি। বাসার ছাদটাকে মনে হলো অনেক উঁচুতে, বিছানাটা মনে হলো অনেক শক্ত। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি আমি রীতিমতো শার্ট-প্যান্ট-মোজা পরে ঘুমাচ্ছি, সবচেয়ে বড় কথা এই বিদঘুটে শব্দটা কী, আর সেটা কোথা থেকে আসছে আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ করে আমার সবকিছু মনে পড়ল, আর আমি তখন তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠলাম। শব্দটা কী সেটাও আমি সাথে সাথে বুঝতে পারলাম, এটা হচ্ছে কিচিমিচি পাখির ডাক! একটা দুইটা পাখির ডাক আমি শুনেছি, কিন্তু এটা তো দেখি রীতিমতো পাখির মেলা। আমার পাশে রাজু গুটিশুটি মেরে ঘুমাচ্ছে, রাজুর পাশে আব্বু। আম্মু আর আপুকে দেখতে পেলাম না। তারা মনে হয় অন্য ঘরে ঘুমাচ্ছে।

আমি উঠে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালাম, সাথে সাথে বুঝে গেলাম এখানে এত পাখি কোথা থেকে এসেছে। এই বাসাটা একটা টিলার উপরে। এখান থেকে চারিদিকে যত দূর চোখ যায় শুধু গাছ আর গাছ! প্রত্যেকটা গাছে যদি একটা করেও পাখির ফেমিলি থাকে তাহলেই এখানে কয়েক হাজার পাখি হয়ে যাবে! আমি হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, আমাদের আগের বাসার জানালা দিয়ে তাকালেই দেখা যেত আরেকটা বিল্ডিং, সেটার পিছনে ভালো করে তাকালে দেখা যেত আরেকটা বিল্ডিং! আর এখানে আশেপাশে কোথাও কোনো ঘরবাড়ি নেই, টিলাটা একদিকে নিচু হয়ে নেমে গেছে সেখানে একটা ধান ক্ষেত। ধান ক্ষেতের অন্যপাশে আরেকটা টিলা। অনেক দূরে গাছপালার ভিড়ে আবছা আবছা কয়েকটা

www.MurchOna.com

বাড়িঘর, বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে, সেগুলো নিশ্চয়ই আব্বুর কলেজ, কলেজের মানুষের বাড়িঘর। আমি রীতিমতো হা করে তাকিয়ে রইলাম আর আমাকে দেখেই কি না বুঝতে পারলাম না, পাখিগুলো যা কিচিরমিচির শুরু করল সেটা আর বলার মতো না। একটা দুইটা পাখি যখন ডাকে তখন সেটাকে পাখির ডাকের মতোই শোনা যায়, কিন্তু যখন হাজার হাজার পাখি ডাকে তখন মনে হয় একটা ফ্যাক্টরি চলছে কিংবা একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছে! ঠিক কী কারণ জানি না, গাছগুলো দেখে নাকি পাখির ডাক শুনে—হঠাৎ করে আমার মনটা ভালো হয়ে গেল।

দরজা খুলে বাসা থেকে বের হয়ে একটু ঘুরে আসব কি না চিন্তা করছিলাম ঠিক তখন আম্মু ঘরে এসে ঢুকলেন। এই ভোরেই কোমরে আচল পেঁচিয়ে ঘর বাড়ি গোছাতে শুরু করেছেন। আমাকে দেখে আম্মু বললেন, "কীরে! লিটু, ঘুম ভেঙেছে? এই সকালে উঠে গেলি?"

"হ্যাঁ, আম্মু! পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে গেছে। কেমন কিচিরমিচির করছে, শুনেছ?"

"হ্যাঁ! সকালেই এত চেঁচামেচি সন্ধ্যাবেলা না জানি কী হবে!"

"কেন আম্মু? সন্ধ্যাবেলা কী হবে?"

"সকালবেলা সবাই কাজ কর্মে বের হচ্ছে, তার আলোচনা হচ্ছে। কথা বলার বেশি কিছু নাই! সন্ধ্যেবেলা সবাই কাজকর্ম করে ফিরে আসবে! তখন একেকজনের কত কী বলার থাকবে!"

আম্মুর কথা শুনে আমি হি হি করে হাসলাম, পাখিগুলি হাত-পা নেড়ে সারাদিন কী করেছে সেটা একজন আরেকজনকে বলেছে, দৃশ্যটা চিন্তা করলেই হাসি উঠে যায়। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে গাছ পালাগুলো দেখে আম্মুর দিকে ঘুরে তাকালাম, বললাম, "আম্মু! আমি বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি?"

"যাবি? যা! নূতন জায়গায় আবার হারিয়ে যাস না যেন।"

"চিন্তা করো না আম্মু, আমি হারাব না।"

আমি দরজা খুলে বের হলাম, দরজা খোলার শব্দ শুনেই অনেকগুলো পাখি কিচিরমিচির করতে করতে উড়ে গেল, মানে হলো তারা জরুরি কোনো মিটিং করছিল, আমি এসে তাদের মিটিংটা ভেঙে দিয়েছি।

আমাদের এই নূতন বাসাটা বেশ উঁচু, অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে বাসাটার দিকে তাকালাম। সাদা দেওয়াল আর লাল টালির ছাদ, এত সুন্দর যে চোখ ফেরানো যায় না। আমি পুরো বাসাটা একবার ঘুরে এলাম, এটা মোটেও শহরের বাসাগুলোর মতো না। সামনে বাগান, বাগানের এক পাশে একটা টিউবওয়েল। আর কী আশ্চর্য, টিউবওয়েলের হ্যান্ডেলটা ধরে চাপতেই পানি বের

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

হয়ে এলো। আমি হাতে-মুখে একটু পানি দিলাম—কনকনে ঠাণ্ডা পানি, পানির মাঝে আবার শ্যাওলা শ্যাওলা গন্ধ।

আমি শার্টের হাতায় মুখ মুছে সামনের দিকে হেঁটে গেলাম। নিচে শুকনো পাতা, পায়ের চাপে ভেঙে গুড়িয়ে যাবার সময় কী সুন্দর একটা খচমচ শব্দ হয়। দুই পা এগিয়ে যেতেই পায়ের নিচ থেকে কিলবিল করে কী একটা জানি ছুটে গেল। আমি ভয়ে লাফ দিয়ে পিছনে সরে গেলাম, প্রথমে ভেবেছিলাম সাপ, আসলে সাপ না। এক ধরনের গিরগিটি। সেটা একটা বড় গাছ বেয়ে উঠতে লাগল, আধাআধি উঠে থেমে গিয়ে আমার দিকে তাকালো—আমার মনে হলো বেশ রাগ হয়েই! দেখতে দেখতে গিরগিটিটার গলা টকটকে লাল হয়ে যায়, কী আশ্চর্য! আমি এরকম কথা শুধু বইয়ে পড়েছিলাম নিজের চোখে দেখব কখনো চিন্তা করি নি!

আমি সাবধানে আরেকটু হেঁটে গেলাম, বড় বড় গাছগুলো দেখে কেমন যেন অবাক লাগে। গাছের ওপর পুরু শুকনো বাকল, মোটা মোটা ডালপালা, তার ওপর ঘন সবুজ পাতা। এরকম একটা গাছের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে কী মজাই না লাগত! আমি ওপরের দিকে তাকালাম আর কী আশ্চর্য! সত্যি সত্যি একজন পা দুলিয়ে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে আমাকে দেখছে। আমি ভয়ে একটা চিৎকার দিয়েই ফেলেছিলাম তখন বুঝলাম এটা আসলে একটা বানর। রাস্তায় বানরের খেলা দেখে আমার ধারণা হয়েছিল বানর হচ্ছে শুকনো এবং রোগা পটকা এবং এরা শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না, সবসময়েই তিড়িংবিড়িং করে লাফ-ঝাপ দেয়। এই বানরটা মোটেও রোগা-পটকা না, এটা বিশাল এবং এটা মোটেও বাঁদরামো করছে না খুব শান্তভাবে বসে আমাকে দেখছে। বানরটা ওপর থেকে আমার ওপর লাফিয়ে পড়বে কি না সেটা নিয়ে আমার ভয় হতে লাগল এবং আমি সাবধানে পিছিয়ে যেতে লাগলাম, হঠাৎ করে একটা গাছের গুড়িতে পা বেধে আমি আছাড় খেয়ে পড়লাম এবং বানরটা সেটা দেখে হি হি করে হাসতে শুরু করল। আমি অবাক হয়ে বানরটার দিকে তাকালাম এবং দেখলাম সে মোটেও হাসছে না, আমার দিকে উদাসী চোখে তাকিয়ে আছে। অন্য কেউ হাসছে, আমি চোখ ঘুরিয়ে তাকালাম এবং দেখলাম আমার বয়সী একটা ছেলে পেটে হাত দিয়ে হাসছে, মনে হচ্ছে হাসতে হাসতে সে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করবে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে শরীর থেকে শুকনো ধুলা-মাটি ঝেড়ে ছেলেটার দিকে তাকালাম, এত রাগ উঠছিল যে বলার মতো না। ছেলেটার দিকে চোখ পাকিয়ে বললাম, "হাসছ কেন?"

www.MurchOna.com

ছেলেটা অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, "বান্দরটা দেখে তুমি ভয় পেয়ে যেভাবে উল্টা দিকে একটা দৌড় দিছ, তারপরে যেইভাবে আছাড় খাইছ সেইটা দেখলে যে-কোনো মানুষ হাসতে হাসতে শেষ হয়ে যাবে।"

"আমি মোটেও ভয় পেয়ে দৌড় দেই নাই—"

"ঠিক আছে ঠিক আছে দৌড় দেও নাই! আছাড় তো খাইছ?"

"আছাড় খেলেই হাসতে হবে?"

"ঠিক আছে ঠিক আছে আমার দোষ হইছে। আমার হাসা উচিত হয় নাই। কিন্তু হাসি উঠে গেলে আমি কী করব?" বলে সে আবার হি হি করে হাসতে শুরু করল।

হাসি জিনিসটা একটু সংক্রামক। তা ছাড়া ছেলেটার চেহারা কথাবার্তার মাঝে কিছু একটা আছে যেটা দেখলে বেশিক্ষণ রেগে থাকা যায় না। তাই আমিও তার সাথে হেসে ফেললাম।

ছেলেটা বানরটা দেখিয়ে বলল, "এ হচ্ছে ভোতা সুন্দরী। সব সময় মুখটা ভোতা করে থাকে তো সেইজন্যে ভোতা সুন্দরী। ভোতা সুন্দরী আসলে ঠাণ্ডা মেজাজের বান্দর। ঝামেলা করে না। তবে এর বয় ফ্রেন্ড নিয়ে সমস্যা!"

"এর আবার বয় ফ্রেন্ড আছে নাকি?"

"আছে। বয় ফ্রেন্ডের নাম দিছি টোগা সন্ত্রাসী।'

"টোগা সন্ত্রাসী?"

"হ্যাঁ। সেই বান্দরটা হচ্ছে মহা সন্ত্রাসী। সে যদি এইখানে থাকত তাহলে দেখতা কী করত। লাফ-ঝাপ দিত তোমারে মুখ ভ্যাংচাইত গাছের ডাল ধরে ঝাকাইত। চিল্লাফাল্লা করত! এই জন্যেই তো এরে নাম দিছি টোগা সন্ত্রাসী।"

"তুমি সব বানরের নাম দিয়েছ?"

"সবগুলারে পারি নাই। যেইগুলার সাথে চিনা পরিচয় আছে সেইগুলারে দিছি। পাখিগুলারে নিয়ে সমস্যা—"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "পাখিদেরও নাম দিয়েছ? এইখানে তো হাজার হাজার পাখি!"

"হ্যাঁ। সেই জন্যে সমস্যা। তবে সবচেয়ে সোজা হচ্ছে গাছদের নাম দেওয়া। তারা লড়ে চড়ে না। যেমন মনে করো এই গাছটারে নাম দিছি মটকু মিয়া। গাছ তো মোটা, সেইজন্যে মটকু মিয়া। আর ঐটা হচ্ছে লম্বু। তারপাশে যে রেন্ডি গাছটা দেখছ তো সেইটার নাম দিছি ট্যারাচান।"

আমি একটু অবাক হয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইলাম এবং সে আমাকে গাছগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল। এরকম আজব ছেলে আমি খুব

www.MurchOna.com

বেশি দেখি নাই; গাছগুলির নাম বলে শেষ করার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি গাছের নাম দিচ্ছ ব্যাপারটা কী?"

সে দাঁত বের করে হাসল, বলল, "গাছের সাথে কথাবার্তা বললে তাদের মন-মেজাজ ভালো থাকে। বিজ্ঞান মতে এইটা দেখা গেছে। সেই জন্যে আমি গাছের সাথে কথা বলি। একটা নাম না থাকলে কথা বলা কঠিন—"

"ও!" ব্যাপারটা আমার কাছে একটু পরিষ্কার হতে শুরু করেছে! "তুমি গাছের সাথে কথা বলো?"

ছেলেটা একটু সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকালো, বলল, "বলিই তো। তাতে ক্ষতি কী হয়েছে?"

"না, না কানো ক্ষতি হয় নাই।" আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "গাছ কি তোমার কথার উত্তর দেয়।"

"গাছের কি আমাদের মতো মুখ আছে যে উত্তর দিবে? তারা তাদের মতো করে উত্তর দেয়।"

"সেইটা কী রকম?"

"এই মনে করো একটা গা ঝাড়া দেয়। কিংবা একটা ডাল নাড়ায়।"

আমার মুখে নিশ্চয়ই একটা অবিশ্বাসের হাসি চলে এসেছিল, কারণ ছেলেটা কেমন জানি রেগে উঠল, বলল, "তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর না! তাই তো? তুমি দেখতে চাও? নিজের চোখে দেখতে চাও?"

"দেখাও।"

"ঠিক আছে তুমি এই গাছটারে ধরে দাঁড়াও।"

আমি ছেলেটার কথামতো মটকু মিয়াকে ধরে দাঁড়ালাম। ছেলেটা তখন ওপর দিকে তাকিয়ে বেশ মোলায়েম গলায় ডাকল, "মটকু মিয়া। এই মটকু মিয়া—" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কিছু টের পয়েছ?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "না, পাই নাই।"

"ভালো করে মনোযোগ দাও। তাহলে টের পাবা। দিয়েছ?"

আমি অনেক কষ্ট করে হাসি চেপে রেখে মনোযোগ দেওয়ার ভান করলাম, এই বিচিত্র ছেলেটা আবার মধুর স্বরে গাছটাকে ডাকল। আমি বললাম, "আমার কী মনে হয় জান?"

"কী?"

"গাছের তো অনেক বয়স হয়। এই গাছটার বয়স কত মনে হয়?"

ছেলেটা গাছটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলল, "একশ বছরের কম না।"

"এই এত বয়স্ক একটা গাছকে তুমি নাম ধরে ডাকছ, সে কি রাগ হচ্ছে না।"

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

ছেলেটা আমার দিকে ভুরু কুচকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, "তোমার কী মটকু ভাই না হলে মটকু চাচা ডাকা উচিত না।"

ছেলেটা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল, বলল, "তুমি কথাটা মনে হয় ভুল বল নাই। আমার মনে হয় বেয়াদপী হয়েছে।"

আমার হাসি উঠে যাচ্ছিল কিন্তু ছেলেটার গম্ভীর মুখ দেখে হাসি চেপে রাখলাম। গাছের সঙ্গে বেয়াদপী করে ফেলেছে সেটা নিয়ে আবার না বেশি মন খারাপ করে ফেরে সেই জন্যে বিষয়টা বদলানোর জন্যে বললাম, "তুমি কোন স্কুলে পড়?"

"সরকারি স্কুলে।"

"কোন ক্লাশে?"

"সেইটা এখনো ঠিক জানি না।"

আমি একটু অবাক হয়ে ছেলেটার দিকে তাকালাম, জিজ্ঞেস করলাম, "জান না মানে?"

"এক সাবজেক্টে ফেল করেছি সেই জন্যে প্রমোশন দেয় নাই। বাবা গিয়ে বললে মনে হয় দিয়ে দেবে। যদি প্রমোশন দেয় তাহলে ক্লাশ এইট। না দিলে সেভেন।"

এরকম একটা বিষয় নিয়ে কীভাবে আলোচনা করব বুঝতে পারছিলাম না, তার পরেও চেষ্টা করলাম, "তোমার বাবা স্কুলে গিয়ে বলেন নাই?"

"বাবা এখনো জানে না। জানলে আমার খবর আছে।"

আমি বললাম, "ও।"

ছেলেটা মাথা ঘুরিয়ে তার বাম কানটা দেখিয়ে বলল, "এই দেখো।"

আমি ঠিক কী দেখব বুঝতে পারলাম না, ছেলেটা তখন নিজেই বলল, "এই কানের লতিটা একটু বেশি লম্বা না?"

আমার কাছে সেরকম মনে হলো না কিন্তু ছেলেটার কথায় রাজি হয়ে বললাম, "হুঁ।"

"বাবা টেনে লম্বা করে ফেলেছে!"

"কেন?"

"পড়ালেখা করি না তো।"

"কেন কর না?"

ছেলেটা উদাস মুখে মটকু মিয়ার ডালে বসে থাকা ভোতা সুন্দরীর দিকে একবার তাকালো তারপর দূরে ট্যারাচানের দিকে তাকালো তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ভালো লাগে না!"

এর উপরে কোনো কথা হয় না, তাই আমি কোনো কথা না বলে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, সত্যি কথা বলতে কী এবারে সত্যি সত্যি তার বাম কানের

www.MurchOna.com

লতিটাকে আমার একটু বেশি লম্বা মনে হতে লাগল। আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ মনে হলো দূর থেকে কেউ একজন আমাকে ডাকছে। কিনকিনে গলার স্বর—নিশ্চয়ই রাজু! আমি বললাম, "আমাকে ডাকছে, আমি যাই।"

ছেলেটা ভুরু কুচকে আমার দিকে তাকালো, "তুমি প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসায় থাক?"

আমি মাথা নাড়লাম। ছেলেটা হাত নেড়ে বলল, "যাও!"

আমি মটকু মিয়ার তলা দিয়ে, লম্বুর ডান পাশে হয়ে ট্যারাচনকে পাশ কাটিয়ে যখন বাসায় ফিরে যাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ মনে হলো আমি সব গাছগুলোর নাম জানি, কিন্তু যে ছেলেটা এই নামগুলো দিয়েছে তার নাম জিজ্ঞাস করতে ভুলে গেছি! আবার দেখা হবে কী না কে জানে।

বাসায় আসতেই রাজু আমার কাছে ছুটে এলো, চোখ বড় বড় করে বলল, "ভাইয়া তুমি জান কী হয়েছে?"

"কী?"

"আমি একটা কলা খেতে খেতে এই বাইরে দাঁড়িয়েছি। তখন হঠাৎ একটা..."

রাজু বড় করে একটা নিঃশ্বাস নেবার জন্যে একটু থামল, আমি তখন বললাম, "বানর?"

আপু ভুরু কুচকে বলল, "তুই কেমন করে জানিস?"

আমি বললাম, "কলাটা কেড়ে নিয়ে তোকে মুখ ভেংচি দিয়েছে?"

রাজু অবাক হয়ে "হ্যাঁ!"

"গাছের ওপর লাফ-ঝাপ দিয়েছে? গাছের ডাল ঝাকিয়েছে? চিল্লাফাল্লা করেছে?"

"হ্যাঁ।"

"ও হচ্ছে টোগা সন্ত্রাসী।"

আপু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, "তুই কেমন করে জানিস?"

"তার গার্ল ফ্রেন্ডের সাথে দেখা হলো তো—"

আপু একবার আমার মুখের দিকে আরেকবার আম্মুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখেছ আম্মু, আমাদের লিটু এর মাঝে কত বন্ধু জোগাড় করে ফেলেছে?"

আমি বললাম, "এখনো তো তোমাদের মটকু মিয়া, লাবু আর ট্যারাচানের কথা বলিই নাই! তুমি জান এইখানে কত বন্ধু আমার?"

www.MurchOna.com

২.

আমি যখন আমার নূতন স্কুলে ক্লাশে ঢুকব তখন একটা ছেলে-মেয়েকেও আমি চিনব না, তারা ড্যাবড্যাবে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, ব্যাপারটা চিন্তা করেই আমার পেটের ভাত চাউল হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আসলে সেটা মোটেও সেরকম হলো না—আমি যখন ক্লাশরুম খুঁজে ঢুকেছি তখন সেখানে একজন আমাকে দেখেই দুই হাত নেড়ে চ্যাঁচাতে শুরু করল, "প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলে! প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলে!"

ছোট শহরে কলেজের প্রিন্সিপাল মনে হয় খুব বড় জিনিস, সবাই খুব গুরুত্ব দেয়, ক্লাশে আসার আগেই আমাকে চিনে ফেলছে এই ছেলেটিকে আমি ভালো করে দেখার চেষ্টা করলাম! মাথার চুল তেল জবজব করে আচড়ে এসেছে, শরীরে ফিটফাট স্কুলের পোশাক সেইজন্যে প্রথমে চিনতে পারি নাই, এটি হচ্ছে সেই ছেলে যার সাথে আমার প্রথম দিন দেখা হয়েছিল, যে আমাক ভোতা সুন্দরীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, টোগা সন্ত্রাসীর কথা বলেছিল। ক্লাশে একজন পরিচিত ছেলে পেয়ে আমার জানে পানি চলে এলো।

"আস, আস, তুমি আমার কাছে বস।" বলে ছেলেটা আমাকে তার কাছে নিয়ে বসাল! আমি যে-রকম অনুমান করেছিলাম ঠিক সেরকম একেবারে শেষ বেঞ্চের শেষ মাথায়।

আমি গলা নামিয়ে বললাম, "তোমার আব্বু তাহলে এসেছিলেন?"

সে উত্তর না দিয়ে তার বাম কানটা আমাকে দেখাল তারপর ফিস ফিস করে বলল, "এই দেখো, বাবা টান দিয়া এক দিনে আরো আধ ইঞ্চি লম্বা কইরা ফেলেছে!"

নূতন ক্লাশে প্রমোশন পাবার জন্যে কানের লতি আধ ইঞ্চি লম্বা হতে দেয়া যায় কি না আমার জানা নেই, সেইটা নিয়ে আলোচনা করা যায় কি না সেটাও

www.MurchOna.com

আমার জানা নেই, তাই আলাপটা অন্যদিকে নেওয়ার জন্যে বললাম, "সেইদিন তোমার নামটা আমার জিজ্ঞেস করা হয় নাই।"

"আমার নাম?" ছেলেটা ঠোঁট উল্টে বলল, "নামটা বেশি ভালো না—এস.এস.সি-এর রেজিস্ট্রেশনের সময় বদলায়া দিব ঠিক করেছি।"

"কিন্তু তোমাকে এখন কেউ কিছু ডাকে না?"

"ডাকে। স্কুলে সবাই ডাকে রতন। বাসায় বাবা ডাকে..."

বাবা কী ডাকে সেটা বলতে গিয়ে রতন থেমে গেল! আমার কাছে মাথা নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "এই যে এখন যে ছেলেটা ক্লাশে ঢুকছে, এরে চিনে রেখো। এর নাম হইল সাদিব।"

"চশমা চোখের ছেলেটা?"

"হ্যাঁ। ফাস্ট বয়। ফাটাফাটি মুখস্ত করতে পারে। পরীক্ষার সময় সাদিবের পাশে সিট পড়লে আর কোনো চিন্তা নাই। চোখের কোনা দিয়ে এর খাতা দেখবা আর লিখবা! চোখ বন্ধ করে পাশ মার্কে উইঠা যাবে!"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। তাদের বাসায় গেলে দেখবা তার বাবা মা ভাই বোন সবাই খালি লেখাপড়া নিয়ে কথা বলে। একজন একটা মুখস্ত বলে তখন আরেকজন আরেকটা মুখস্ত বলে। কোনো নরমাল কথা নাই।"

আমি ফাস্ট বয় সাদিবকে দেখছিলাম তখন রতন আরো কাছে এসে গলাটা আরো নিচু করে বলল, "এখন যে ছেলেটা আসছে তার নাম হচ্ছে সুমন। এরেও ভালো করে চিনে রাখো।

"কেন?"

"এর বাবা টি.এন.ও.। তুমি যদি সুমনের সাথে উল্টা-পাল্টা কিছু করো তাহলে তোমার খবর আছে। পুলিশ বিডিআর এসে তোমারে ধইরা নিয়ে যাবে। তারপর যা একটা মাইর দিব তুমি চিন্তাও করতে পারবা না।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।" রতন আরো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তখন দুজন মেয়ে কথা বলতে বলতে ঢুকল। রতন আমার পেটে খোচা দিয়ে বলল, "এই দুজন মেয়েরেও চিনে রাখো। ডান দিকের মেয়েটার নাম মাধুরী। আমার ধারণা কী জান?"

"কী?"

"এই মাধুরী মেয়েটা আসলে একটা পরী।"

"পরী?" আমি ভালো করে মেয়েটার দিকে তাকালাম, একেবারেই সাদাসিধে

ধরনের মেয়ে, মোটেও পরীর মতো দেখতে নয়।

"হ্যাঁ। মানুষের বেশ ধরে স্কুলে আসে।"

"কেন? পরীর দেশে ভালো স্কুল নাই?"

রতন আমার দিকে একটু বিরক্ত হয়ে তাকালো, বলল, "আমি সেইটা বলি নাই।"

"তাহলে কোনটা বলেছ?"

"মাধুরীর চোখের দিকে তাকালেই দেখবা। চোখের মণি গোল না। লম্বা। বিড়ালের মতন।"

আমি অবাক হয়ে রতনের দিকে তাকালাম, একজন মানুষের চোখের মনি লম্বা আগে কখনো শুনি নি। আমি এটা নিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম তখন সে গলা নামিয়ে বলল, "আর বাম দিকের মেয়েটা হচ্ছে এই ক্লাশের সবচেয়ে ডেঞ্জারাস মেয়ে।" কথাটা বলেই সে কেমন যেন শিউরে ওঠে। "এর নাম হচ্ছে মাদার টেনিয়া।"

"মাদার টেনিয়া?"

"হ্যাঁ। আসল নাম মনে হয় ছিল তানিয়া। এখন কেউ সেই নাম জানে না। তার বাবা মায়েও তারে ডাকে মাদার টেনিয়া।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন? মাদার টেনিয়া কেন ডাকে?"

"খালি লোকজনের উপকার করতে চায় সেই জন্যে নাম মাদার টেনিয়া।"

আমি তখনও বুঝতে পারলাম না, একটা মেয়ে যদি সবার উপকার করতে চায় তাহলে সে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস কেন হবে! রতনকে জিজ্ঞেস করলাম, "উপকার করা তো ভালো! এইটা ডেঞ্জারাস কেন হবে?"

রতন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "মনে করো সে ঠিক করল তোমার উপকার করবে। কিন্তু তোমার কোনো উপকারের দরকার নাই তখন সে কী করবে জান?"

"কী করবে?"

"তোমারে ল্যাং মেরে ফালাইয়া দিয়ে তোমার ঠ্যাং ভেঙে দিবে। তখন তোমার উপকার করার একটা সুযোগ হবে। তোমারে টাইনা হাসপাতালে নিবে, চিকিৎসা করবে। ওষুধ খাওয়াবে।"

আমি কী বলব, ঠিক বুঝতে পারলাম না। অবাক হয়ে রতনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ঠিক তখন আরো কয়েকজন ঢুকছিল রতন তখন তাদের সম্পর্কেও বলতে শুরু করল। মজার ব্যাপার হলো রতনের কথা সত্যি হলে এই ক্লাশে

www.MurchOna.com

একটাও স্বাভাবিক ছেলে বা মেয়ে নেই। কেউ মাথা খারাপ, কারো উপরে জিনের আছর আছে, কেউ বড় হলে সন্ন্যাসী হবে, কারো দাদা ডাকাতের সর্দার ছিলেন, কেউ ঘুমের মাঝে হাঁটে, কেউ স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে—এমনকী দুইজন সম্পর্কে সে দাবি করল যে তারা কাচা মাংশ খায়! রতন আরো বলত—কিন্তু ঠিক এরকম সময়ে ঘণ্টা পড়ে গেল বলে বাকীটা শুনতে পারলাম না। যেটুকু শুনেছি তাতে মনে হচ্ছে রতন যা যা বলেছে তার অল্প একটুও যদি সত্যি হয় তাহলে এই ক্লাশের ছেলেমেয়ের মতো এরকম আজব ছেলে মেয়ে পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না!

এসেমব্লী শেষে যখন ক্লাশে ফিরে এসেছি তখন মোটাসোটা একজন আপা ক্লাশ নিতে এলেন। দেখে আমার ভালোই লাগল—মোটাসোটা মানুষেরা হাসিখুশি হয় আর হাসিখুশি একজন ক্লাশ টিচার দিয়ে যদি দিনটা শুরু করা হয় তাহলে মনে হয় সারাটা দিন ভালোই কাটবে! আপা রেজিস্টার খাতা বের করে রোল কল নিলেন, সবার শেষরোল নাম্বারটি রতনের। তার রোল নম্বর ডাকা শেষ হলে একটুকরা কাগজ দেখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নূতন একজন ভর্তি হয়েছে এই ক্লাশে। সে আছে এখানে?"

আমি উঠে দাঁড়ালাম, আপা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "তোমার চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি এজন শান্তশিষ্ট ভালো মানুষ। আসলে তুমি মানুষটা কী রকম?"

এই প্রশ্নের কী উত্তর দেয়া উচিত আমি বুঝতে পারলাম না বলে একটু মাথা চুলকালাম, আপা বললেন, "তোমার নামে কোনো পুলিশ কেস আছে? কখনো এ্যারেস্ট হয়েছ, জেল খেটেছ?"

আমি দাঁত বের করে হাসলাম, বললাম, "না আপা।"

"তাহলে তোমাকে আগের স্কুল থেকে টি সি দিয়ে কেন বিদায় করে দিল?"

আমি আবার হাসার চেষ্টা করলাম, বললাম, "আব্বু তো বদলী হয়ে এইখানে এসেছেন সেইজন্যে..."

"ও আচ্ছা!" আপা এমন ভান করলেন যেন তার খুব একটা দুশ্চিন্তা দূর হলো, "তাহলে তোমার নামে পুলিশ ওয়ারেন্ট নাই। কোনো সিরিয়াস ক্রাইমের জন্যে পুলিশ তোমাকে খোঁজাখুঁজি করছে না?"

"না, আপা।"

"গুড। তাহলেই হবে।" আপা ক্লাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হবে না?"

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

চশমা পরা ফার্স্ট বয় সাদিব বলল, "আপা এখন এই নূতন ছেলেটার ধারণা হবে আমাদের ক্লাশটাই বুঝি এরকম। সবাইকে বুঝি পুলিশ খোঁজাখুঁজি করে!"

"সেটা হলে কী ভুল হবে?" আপা খুব গম্ভীর হবার ভান করে বললেন, "আমি যখন তোমাদের ক্লাশের ক্লাশ টিচার হয়েছি, তখন সবাই আমাকে সাবধান করে বলেছে তোমরা নাকি খুব ডেঞ্জারাস ক্লাশ!"

"ভালোভাবে ডেঞ্জারাস আপা! ভালোভাবে।"

"ঠিক আছে, দেখা যাবে সেটা।" আপা এবারে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "রোল নাম্বার ফিফটি থ্রি, তোমাকে আমরা কী নামে ডাকব?"

"লিটু—আর ভালো নাম হচ্ছে..."

"ভালো নাম এই খাতাতেই থাকুক। লিটুই ভালো। খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করো তাহলে তোমার নামকে প্রমোশন দিয়ে দেবো সেটা হয়ে যাবে লি-ওয়ান!"

ক্লাশের সবাই হি হি করে হেসে উঠল। একজন বলল, "আর যদি পড়াশোনা না করে তখন?"

"তখন নামের ডিমোশন হবে। লিটু হয়ে যাবে লি-থ্রী না হয় লি-ফোর। কিংবা কে জানে লি-টুয়েন্টিফাইভ!"

ক্লাশের সবাই আবার হি হি করে হাসতে লাগল, আমি যেরকম ভেবেছিলাম ঠিক সেরকমই হয়েছে। এই আপা আসলেই হাসিখুশি। আপা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাহলে লিটু। ওয়েল কাম টু আওয়ার স্কুল। তোমার কি এই স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু বলার আছে?"

আমি জোরে জোরে মাথা নাড়লাম, "নাই, আপা নাই।"

আপা তখন ক্লাশের ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের কি কারো লিটুকে কিছু বলার আছে?"

সবাই মাথা নেড়ে জানালো, যে তাদের বলার কিছু নেই, শুধু মাধুরী নামের মেয়েটা হাত তুলে বলল, "আছে আপা আছে।"

"বলো।"

মাধুরী আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "গাছদের বয়স অনেক বেশি সেই জন্যে তুমি নাকি গাছদের চাচা বলে ডাকো?"

মাধুরীর কথা শুনে আমি এত অবাক হলাম যে বলার নয়। জিজ্ঞেস করলাম, "তোমাকে কে এটা বলেছে?"

"রতন।"

www.MurchOna.com

তার মানে রতন হচ্ছে এক নম্বরের মিচকে শয়তান, সে যে-রকম অন্য সবার সম্পর্কে আজগুবি আজগুবি কথা আমাকে বলেছে, ঠিক সেরকম আমার সম্পর্কেও আজগুবি আজগুবি কথা অন্যদেরকে বলেছে! আমি রতনের দিকে তাকালাম সে মুখে একটা উদাস উদাস ভাব করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। আমি কী উত্তর দিব বুঝতে পারলাম না। বললাম, "না-মানে ইয়ে আসলে যেটা হয়েছিল..."

মাধুরী বলল, "তার মানে আসলেই বলেছ!" সে এবং তার সাথে সাথে অন্য সবাই হাসা শুরু করল। একজন ছেলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "গাছের ভাতিজা গাছের ভাতিজা!"

আমার মনে হলো রতনকে তার ঘাড় মটকে দিই, সামনে আপা না থাকলে নিশ্চয়ই চেষ্টা করতাম। মাধুরী মুখ গম্ভীর করে বলল, "তুমি কেন গাছদের চাচা বলে ডাকো? খালা কিংবা চাচী কেন ডাকো না?"

ক্লাশের সবাই আবার হি হি করে হেসে উঠল। আমি মহা বিপদের মাঝে পড়ে গেলাম—প্রথম দিন ক্লাশে এসেই এই অপমান! এখনই যদি কিছু না করা হয় তাহলে সবাই আমাকে ভাতিজা বলে ডাকবে। কী সর্বনাশ! কিছু একটা করতেই হবে, তাই শেষ চেষ্টা করলাম, বললাম, "আসলে গাছদের আমি চাচা ডাকি কি না সেটা অন্য আরেকটা জিনিসের ওপর নির্ভর করে।"

"কোন জিনিসের উপর?"

"তোমার চোখের উপর!"

ক্লাশের সব ছেলে মেয়ে এবার কৌতূহলী হয়ে একবার আমার দিকে আরেকবার মাধুরীর দিকে তাকালো! মাধুরী কেমন যেন অবাক হয়ে বলল, "আ-আমার চোখের উপর?"

"হ্যাঁ। রতন বলেছে তোমার চোখের মনি বিড়ালের চোখের মতন লম্বা। তোমারটা যদি সত্যি হয় তাহলে আমারটাও সত্যি!"

মাধুরী লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কী বলেছে? রতন কী বলেছে?

রতন খামচি দিয়ে আমার শার্টের হাতা ধরে টানতে শুরু করল। আমি নিজের হাতটা ছুটিয়ে নিয়ে বললাম, "বলেছে তুমি আসলে একটা পরী। মানুষের বেশ ধরে ক্লাশ করতে আসো।"

ক্লাশের সবাই এবারে হেসে গড়াগড়ি খেতে শুরু করল। আপা কিছুক্ষণ হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করে নিজেও হি হি করে হেসে উঠলেন। শুধু মাধুরী চোখ কটমট করে রতনের দিকে তাকিয়ে রইল। আর ক্লাশে কী হচ্ছে কিছুই টের পাচ্ছে

www.MurchOna.com

না এরকম ভান করে রতন উদাস উদাস মুখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। ক্লাশে হাসি একটু কমে আসার পর মাধুরী বলল, "আপা, আপনাকে এর বিচার করতে হবে। এই রতন কেমন ফাজিল আপনি দেখেছেন?"

ক্লাশে একটা গুঞ্জন শুরু হলো এবং আরেকজন দাঁড়িয়ে বলল, "আপা এই রতনা আমার সম্পর্কে কী বলেছে জানেন?"

"কী বলেছে?"

"আমি নাকি কাচা মাংশ খাই!"

"খাও নাকি?"

"না আপা, ফুটবল খেলা দেখছিলাম তখন একটা মশা গলায় ঢুকে গেল। ইচ্ছে করে খাই নাই..."

ক্লাশের সবাই হাসতে শুরু করল, হাসি একটু কমে আসার পর ছেলেটা বলল, "প্রথমে এই রতনা সবাইকে বলে বেড়াতে লাগল আমি মশা ধরে ধরে খাই। তারপর বলতে লাগল আমি ঘাস ফড়িঙ ধরে খাই, তারপর বলতে লাগল আমি ব্যাঙ ধরে খাই। এখন কয়দিন থেকে বলছে আমি কাচা মাংশ খাই..."

আরো কয়েকজন তখন একসাথে কথা বলতে শুরু করল, এবং আমি আবিষ্কার করলাম রতন আমাকে যে কথাগুলো বলেছে সেই ধরনের কথা সে অন্যদেরকেও বলেছে! আপা এতক্ষণ হাসছিলেন এবারে চেষ্টা করে একটু গম্ভীর হয়ে ডাকলেন, "রতন।"

রতন উঠে দাঁড়াল। আপা বললেন, "এখানে আসো। ক্লাশের সামনে।"

রতন চোখে-মুখে খুব এটা করুণ ভাব ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তখন আপা আবার ডাকলেন, "কী হলো? আসছ না কেন?"

রতন তখন হেঁটে ক্লাশের সামনে গিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়াল, আপা বললেন, "তুমি এখন বলো তোমার কী বলার আছে? তুমি কেন তোমার বন্ধুদের সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলো?"

রতন বলল, "বানিয়ে বানিয়ে বলি না।"

"তাহলে তুমি কেন বলেছ মাধুরী পরী?"

"মাধুরী একদিন গান গেয়েছিল সেটা শুনে মজিদ স্যার বলেছেন মাধুরীর কিন্নরী কণ্ঠ। কিন্নরী মানে আমি ভাবছিলাম কেন্নো—কিন্তু সাদিব বলেছে কেন্নো না পরী। না হয় দেবী। সেইজন্যে বলেছি..."

মাধুরী হুংকার দিয়ে বলল, "আমার চোখ বিড়ালের মতো?"

"পরীর চোখ মানুষের মতো নাও হতে পারে।" রতন মাধুরীর দিকে তাকিয়ে

www.MurchOna.com

বলল, "বিড়ালের মতো না তুই কেমন করে জানিস? তুই দেখেছিস কখনো পরী?"

মাধুরী হুংকার দিয়ে বলল, "তুই দেখেছিস?"

রতন মাথা নাড়ল, বলল, "দেখেছি।"

মাধুরী আপার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপা দেখেছেন কত বড় মিথ্যুক!"

আপা হাত তুলে বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, আগেই কোনো রকম দোষ দেয়া নয়। আমি আরেকটু দেখি।" তারপর আপা রতনের দিকে তাকালেন, "আর এই যে নূতন ছেলে লিটু সে গাছকে চাচা ডাকে..."

"এইটা আমি মিথ্যা বলি নাই।" রতন আপার দিকে তাকিয়ে বলল, "সে নিজে আমারে বলছে গাছেদের বয়স এত বেশি তাদেরকে ভাই না হয় চাচা ডাকা উচিত।" রতন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "বলো নাই?"

আমি বললাম, "সেইটা আমি তোমাকে ঠাট্টা করে বলেছি যখন তুমি মটকু মিয়াকে ডাকাডাকি করলে মটকু মিয়া উত্তর দিল না।

আপা অবাক হয়ে বললেন, "মটকু মিয়া কে?"

রতন চুপ করে রইল। তাই আমি বললাম, "একটা গাছ। ঐ গাছে ভোতা সুন্দরী বসে থাকে।"

"ভোতা সুন্দরী কে?"

"টোগা সন্ত্রাসীর ইয়ে..."

"কিয়ে?"

সেটা বলাটা উচিত হবে কি না আমি বুঝতে পারলাম না, একটু ইতস্তত করে বলেই ফেললাম, "টোগা সন্ত্রাসীর গার্লফ্রেন্ড।"

আপা চোখ বড় বড় করে বললেন, "টোগা সন্ত্রাসীটা কে?"

"বানর।"

"এই নাম গুলি কোথা থেকে এসেছে?"

রতুন চুপ করে রইল, তাই আমাকে বলতেই হলো, "রতন দিয়েছে।"

আপা এইবার তার দুই হাত দিয়ে তার মাথা চেপে ধরে বললেন, "ব্যাস! ব্যাস! অনেক হয়েছে। গাছের নাম হচ্ছে মটকু মিয়া। সেই গাছে বসে থাকে ভোতা সুন্দরী আর টোগা সন্ত্রাসী। আমার ছাত্রেরা কাচা মাংশ খায়, ছাত্রীরা পরী তাদের চোখ বিড়ালের মতো—নূতন যে এসেছে সে হচ্ছে গাছদের ভাতিজা এবং এইসব কিছু হয়েছে একজন মানুষের জন্য। সেই মানুষটা হচ্ছে রতন। এখন তোরা বল রতনকে কী করব?"

ক্লাশে একটা হৈচৈ শুরু হয়ে গেল, কেউ বলল ছাদে নিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে

www.MurchOna.com

দেয়া হোক। কেউ বলল বাক্সে ভরে বুরুন্ডিতে পাঠিয়ে দেয়া হোক, কেউ বলল শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হোক, কেউ বলল মুখটা টেপ দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হোক—তখন আপা আবার হাত তুলে সবাইকে থামালেন। বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে সবার কথা তো একসাথে শোনা যাবে না। নিয়মমতো করা যাক। প্রথমে জিজ্ঞেস করি রতনকে শাস্তি দেয়ার পক্ষে কতজন?"

ক্লাশের সবাই হাত তুলল। মাধুরী এবং আরো কয়েকজন দুই হাত তুলে রাখল। আপা এবারে বললেন, "ঠিক আছে এখন বল, রতনের পক্ষে কতজন?"

সবাই হাত নামিয়ে ফেলল। ক্লাশের সবাই মনে হয় জানে যে তানিয়ার মায়া একটু বেশি, সে আবার যেন রতনের পক্ষে হাত তুলে না ফেলতে পারে সেজন্যে তার দুই হাত দুই পাশ থেকে দুইজন ধরে রাখল। আপা বললেন, "রতনের পক্ষে একজনও নাই।"

আপার কথা শুনে সবাই আনন্দের মতো একটা শব্দ করল। আপা বললেন, "বিচারের রায় দেবার আগে আসামীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা সুযোগ দেয়া উচিত!" আপা রতনের দিকে তাকালেন, বললেন, "রতন! তোমার কি কিছু বলার আছে?"

রতন বলল, "না আপা! মানে ইয়ে বলছিলাম কী—আমি মানে আসলে..."

"তার মানে তোমার বলার কিছু নাই। সবাই তোমার বিপক্ষে। এইখানে যারা আছে কেউ তোমার পক্ষে নাই।" আপা একটু থেমে বললেন, "তবে..."

রতন চোখ বড় বড় করে তাকাল। আপা বললেন, "এই খানে হাজির নাই এইরকম একজন মানুষ তোমার পক্ষে আছেন!"

সবাই অবাক হয়ে আপার দিকে তাকাল, মাধুরী জিজ্ঞেস করল, "কে আপা?"

"মানুষটাকে তোমরা নিশ্চয়ই চিনো। তার নাম হচ্ছে আইনস্টাইন!"

সবাই অবিশ্বাসের মতো একটা শব্দ করল। সাদিব বলল, "আইনস্টাইন আমাদের রতনের পক্ষে?"

"হ্যাঁ।" আপা মুখ গম্ভীর করে বললেন, "আইনস্টাইন বলেছেন, ইমাজিনেশান ইজ মোর ইম্পর্ট্যান্ট দেন নলেজ। অর্থাৎ জ্ঞান থেকে কল্পনা বড়। কল্পনা করতে পারা একজন মানুষের অনেক বড় গুণ—আমাদের রতন সেইটা পারে। যেহেতু আইনস্টাইন আমাদের রতনের জন্যে ওকালতী করছেন আমরা তাকে মাফ করে দিলাম। আসামী বেকসুর খালাস!"

ক্লাশের সবাই আশাভঙ্গের মতো একটা শব্দ করল। সাদিব বলল, "আপা, আইনস্টাইন অন্য ইমাজিনেশনের কথা বলেছেন। ভালো ভালো ইমাজিনেশান।

www.MurchOna.com

ফিচলামী ইমাজিনেশন!"

আপা মাথা নাড়লেন, "ইমাজিনেশন হচ্ছে ইমাজিনেশন। রতন ফিচলামী দিয়ে শুরু করে আস্তে আস্তে আসল ইমাজিনেশনে যাবে। তাই না রতন?"

রতন খুব গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল আর ভাব দেখে মনে হলো সে নিজেই বুঝি আইনস্টাইন হয়ে গেছে। সে গম্ভীরভাবে হেঁটে আমার পাশে বসে গলা নামিয়ে বলল, "লাভ হইল কিছু?"

"কীসের কথা বলছ?"

"এই যে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করলা?"

"আমি মোটেও তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করি নাই। যেটা হয়েছে সেটা বলেছি।"

"একই কথা।"

"একই কথা না।"

রতন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আচ্ছা, আইনস্টাইন মানুষটার বাড়ি কই জান? কোথায় থাকে?"

"আইনস্টাইন অনেক আগে মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন? আহারে! ভালো মানুষটা ছিল।" আমি দেখলাম রতনের মনটা খারাপ হয়ে গেল। এতদিন পর একজন মানুষকে পেয়েছে যে তার পক্ষে, সেই মানুষটার সাথে দেখা হবার আগেই মানুষটা মারা গেছে, তার মন তো খারাপ হতেই পারে!

পরের ক্লাশে ফর্সা মতন একজন স্যার এসে ঢুকলেন, রতন গলা নামিয়ে আমাকে বলল, "সাবধান।"

"কেন?"

"এই স্যার আসলে মানুষ না।"

"স্যার তাহলে কী?"

"রাক্ষস।"

"রাক্ষস?"

রতন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। স্যার একজন একজন করে ধরেন তারপর কচমচ কচমচ করে কামড় দিয়ে খেয়ে ফেলেন!"

আমি এতক্ষণে রতনের কথা বলার স্টাইল মোটামুটি বুঝে গিয়েছি, তাই বেশি অবাক হলাম না।

www.MurchOna.com

স্যার ডাস্টার দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ড মুছে কয়েকটা অঙ্ক লিখলেন, তারপর বললেন, "এইগুলো লেখ। লিখে মুখস্ত কর।"

আমি রতনকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, "মুখস্ত করব?"

"হ্যাঁ।"

"অঙ্ক আবার মুখস্ত করে কেমন করে?"

রতন আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল, তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম এটা নিশ্চয়ই প্রশ্ন করার কথা না। এই স্যারের ক্লাশ নিশ্চয়ই সবাই মুখস্ত করে! আমি খানিকক্ষণ উশখুশ করে ভাবলাম স্যারকে জিজ্ঞেস করি, হাত তুলে বললাম, "স্যার।"

স্যার আমার কথা শুনে এত অবাক হলেন যে বলার মতো না। চোখ বড় বড় করে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

"স্যার আমি ঠিক বুঝতে পারছি না..."

স্যার জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কে?"

"আমি স্যার নূতন ভর্তি হয়েছি। আমার নাম স্যার..."

"আমি তোর নাম জানতে চেয়েছি?"

আমি থতমত খেয়ে থেমে গেলাম। স্যার বললেন, "আমি বোর্ডে অঙ্ক লিখে দেবো। তুই খাতায় তুলে মুখস্ত করবি। বুঝলি? ক্লাশে একটা কথা না।"

অঙ্ক মানুষ কেমন করে মুখস্ত করে আমি জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম কিন্তু সাহস হলো না। স্যার বললেন, "তুই নূতন এসেছিস তাই ছেড়ে দিলাম। আর কোনোদিন যদি বেয়াদপি করিস চাবকে সিধে করে দেবো।"

আমি একেবারে হতবাক হয়ে স্যারের দিকে তাকিয়ে রইলাম। স্যার বললেন, "বস।"

আমি বসে গেলাম।

রতন ফিসফিস করে বলল, "এখন বুঝছ, এই স্যার কেন রাক্ষস স্যার?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "বুঝেছি।"

রাক্ষস স্যার হুংকার দিলেন, "কে কথা বলে? চাবকে সিধে করে দেবো।"

www.MurchOna.com

৩.

খাবার টেবিলে আম্মু বললেন, "আজকে একটা ভালো খবর আছে আরেকটা খারাপ খবর আছে, কোনটা আগে শুনতে চাস?"

আমি আর রাজু দুজনেই গলা ফাটিয়ে চেঁচালো, "ভালো খবর! ভালো খবর!"

আপু ঢাকায় তার হোস্টেলে তাই সে আগে খারাপ খবরটা শুনতে চাইতে পারল না। আম্মু বললেন, "তোদের রিয়াজ মামা বেড়াতে আসছে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "রিয়াজ মামা কে?"

"আমার চাচাতো ভাই। আমেরিকা থাকে। অনেক বড় সায়েন্টিস্ট।"

রাজু জিজ্ঞেস করল, "আর খারাপ খবরটা কী?"

"খারাপ খবর হচ্ছে আমার ভাই বোনদের মাঝে রিয়াজ সবচেয়ে বখা ছেলে। সেলফিস, বদমেজাজী, বেয়াদপ।"

আব্বু বললেন, "আহ্! কী বলছ বাচ্চাদের সামনে।"

"সত্যি কথা। আমি আমার জীবনে এরকম সেলফিস একজন মানুষ দেখি নাই। এখন থাকে আমেরিকায়, আরেক আজব দেশ—এখন না জানি সে কোন চিড়িয়া হয়েছে।"

আব্বু বললেন, "ছিঃ! নাজু বাচ্চাদের সামনে এভাবে বলো না।"

আম্মু বললেন, "আমার সাথে এমন কোনো ঘনিষ্ঠতাও ছিল না, এত জায়গা থাকতে সে আমার কাছে কেন আসছে তাও বুঝতে পারলাম না। কয়দিন থাকবে কে জানে!"

আব্বু বললেন, "আমাদের কালচারে অতিথি হচ্ছে নারায়ণ। যখন কেউ বেড়াতে আসে তখন খুশি হতে হয়।"

"তাই তো চেষ্টা করছি, পারছি না যে!"

রাজু মাথা নেড়ে বলল, "আম্মু রিয়াজ মামা আসাতে তুমি যদি খুশি না হও

তাহলে এটা তো খারাপ খবর।"

আম্মু বললেন, "ঠিকই বলেছিস। আমার বলা উচিত ছিল একটা মোটামুটি খারাপ খবর আরেকটা বাড়াবাড়ি খারাপ খবর, কোনটা আগে শুনতে চাস!"

আম্মুর কথা শুনে আমরা সবাই হি হি করে হাসতে লাগলাম।

একদিন স্কুল থেকে বাসায় এসে দেখি আম্মুর "বাড়াবাড়ি খারাপ খবর" রিয়াজ মামা চলে এসেছেন। রান্নাঘরে আম্মু সবজি কাটছিলেন রিয়াজ মামা রান্নাঘরে দরজায় পা ছড়িয়ে বসে আছেন। পরনে একটা ভুসভুসে জিন্স আর আধময়লা টি শার্ট। আম্মু বলেছিলেন রাজু মামা হচ্ছে সেলফিস, বদমেজাদী আর বেয়াদপ আমার দেখে সেরকম মনে হলো না, বেশ হাসি-খুশি ভালো মানুষই মনে মনে হতে লাগল। আমাকে দেখে বললেন, "এই তাহলে লিটু! ওরে বাবা এ তো দেখছি রীতিমতো জোয়ান মর্দ মানুষ। আমার মাইন্ডে রয়ে গেছে এই টুকুন গ্যাঁদা।"

আম্মু বললেন, "এদের আর কাজ কী, প্রতিদিন শুধু বড় হয়। সমস্যা তো আমাদের।"

"তোমাদের কী সমস্যা নাজুবু?"

"আমরা প্রতিদিন আরেকটু করে বুড়ো হই।"

রিয়াজ মামা হা হা করে হাসলেন, "না নাজুবু তুমি মোটেই বুড়ো হও নি। তোমাকে ঠিক যেরকম দেখেছিলাম সেরকমই আছ। সত্যি কথা বলতে কী মনে হয় বয়স কমে গিয়েছে—"

"বয়স কমেছে না কচু। আমার চুল অর্ধেক পেকে গেছে।"

রিয়াজ মামা মাথা নাড়লেন, বললেন, "মোটেই পাকে নাই নাজুবু। আর পাকলেই ক্ষতি কী। আজকাল কত রকম হাইটেক ক্যামিকেলস আছে—মাথায় দিবে; চুল কুচকুচে কালো হয়ে যাবে। মানুষ তো আর চুল দিয়ে বুড়ো হয় না।"

"তাহলে কী দিয়ে বুড়ো হয়?"

"মন দিয়ে। মানুষের মন যখন বুড়ো হয় তখন তার চুল যত কুচকুচে কালোই হোক সে শেষ হয়ে যায়।" রিয়াজ মামা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, "বুঝলে নাজুবু, যাকেই দেখি সেই দেখি এরকম থুরথুরে বুড়ো! বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা পর্যন্ত বুড়ো হেয় গেছে।" রিয়াজ মামা একটা নিঃশ্বাস ফেলে আমার দিকে তাকালেন, "লাটু, তুমি বুড়ো হও নি তো?"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে মাথা নাড়লাম, বললাম, "না।"

"ভেরি গুড! কাছে এসো ইয়ংম্যান তোমাকে ধরে দেখি।"

আমি কাছে গেলাম, রিয়াজ মামা আমাকে খপ করে ধরে কাছে টেনে নিয়ে ঘাড় টিপলেন, পেটে চিমটি দিলেন তারপর চুল এলোমেলো করে দিয়ে বললেন, "এই কমবয়সী ছেলেমেয়েদের দেখলে কী ভালো লাগে—এদের পুরো জীবনটা সামনে! এরা যা ইচ্ছে তাই স্বপ্ন দেখতে পারে।"

আমি একটু অবাক হয়ে রিয়াজ মামার দিকে তাকালাম, আম্মু যে-রকম বলেছিলেন সেলফিস বদমেজাজী আর বেয়াদপ তাকে মোটেও সেরকম মনে হচ্ছে না। সত্যি কথা বলতে কী মানুষটাকে আমার বেশ পছন্দই হতে শুরু করেছে।

রাজুটা মোটামুটি একটা গাধা খাবার টেবিলে সে সেটা খুব ভালো মতন প্রমাণ করে দিল। সবাই মিলে খাচ্ছি রিয়াজ মামা মাত্র একটা মজার গল্প শেষ করেছেন তখন রাজু আম্মুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আম্মু, মনে আছে তুমি বলেছিলে রিয়াজ মামা বাড়াবাড়ি খারাপ খবর..."

রাজুকে থামানোর জন্যে আমি টেবিলের তলা দিয়ে একটা লাথি মারার চেষ্টা করলাম, লাথিটা জায়গা মতন লাগল না, লাগলেও খুব এটা লাভ হতো বলে মনে হয় না। রাজু তার কথাটা শেষ করল, বলল, "আমার কাছে কিন্তু রিয়াজ মামাকে ভালোই মনে হচ্ছে!"

আম্মু লজ্জায় একেবারে বেগুনী হয়ে গেলেন, আমি না শোনার ভান করে খেতে লাগলাম, আব্বু চোখ বড় বড় করে রাজুর দিকে তাকিয়ে রইলেন আর রিয়াজ মামা গলা ফাটিয়ে হা হা করে হাসতে শুরু করলেন। কিছুতেই হাসি থামাতে পারেন না আম্মু তখন বাধ্য হয়ে বললেন, "কী হলো, এভাবে হাসছিস কেন?"

রিয়াজ মামা হাসি থামিয়ে চোখ মুছে রাজুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ ইয়ংম্যান! আমি আসলেই ছিলাম বাড়াবাড়ি খারাপ খবর! আমাকে দেখলেই লোকজন মুখ কালো করে ফেলত!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন মামা?"

"তার কারণ আমি ছিলাম গাধা এবং ছাগল। সেলফিস এবং বদমেজাজী আর স্টুপিড। অবনক্সাস আর হিংসুটে। অহংকারী আর বেকুব।"

রাজু জিজ্ঞেস করল, "আপনি এখন আর বেকুব নাই? স্টুপিড নাই?"

রিয়াজ মামা মাথা নেড়ে বললেন, "না, না, না। আমি এখন রীতিমতো ভালো মানুষ। হাসি-খুশি মানুষ, স্মার্ট মানুষ! দেখে বুঝতে পারছ না?"

রাজু মাথা নাড়ল, আমিও মাথা নাড়লাম। রাজু জিজ্ঞেস করল, "আপনি

www.MurchOna.com

কেমন করে ভালো হয়ে গেলেন?"

"এই যে এইটার কারণে।" বলে রিয়াজ মামা তার টি শার্টটা ওপরে তুললেন আমরা দেখলাম তার পাঁজরের কাছে প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা একটা কাটা দাগ।

আম্মু রীতিমতো শিউরে উঠে বললেন, "সর্বনাশ! কী হয়েছিল?"

রিয়াজ মামা বললেন, "নিউ ইয়র্কে একটা কনফারেন্স থেকে যাচ্ছিলাম, সন্ধ্যেবেলা ক্যাব আমাকে সেন্ট্রাল পার্কের কাছাকাছি নামিয়েছে। আমি পার্কের ভিতর দিয়ে একটা শর্টকাট মারছি। হঠাৎ কোথা থেকে দুইজন মানুষ হাজির, একজনের কালো চুল আরেকজনের সোনালি চুল। কম বয়স, কাছাকাছি এসে স্প্যানিশ ভাষায় কী যেন বলল। কথাটার অর্থ না বুঝলেও কী বোঝাতে চেয়েছে সেটা পরিষ্কার বুঝেছি—আমার টাকা-পয়সা চাইছে! কী করব বুঝে ওঠার আগেই সোনালি চুলের ছেলেটা একটা লম্বা চাকু বের করে ঘ্যাচ করে বুকের মাঝে বসিয়ে দিল!"

রিয়াজ মামা এমনভাবে বললেন যেন বুকের মাঝে চাকু বসিয়ে দেয়াটা খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনা। রাজু চোখ বড় বড় করে বলল, "মামা, তোমার ব্যাথা লাগে নাই?"

"নাহ্!" মামা মাথা নাড়লেন, "সেরকম ব্যাথা টের পাই নাই। হঠাৎ করে দেখি নিঃশ্বাস নিতে পারি না। ধড়াম করে পড়ে গেলাম। তার পরে আর কিছু মনে নাই।"

আম্মু বললেন, "কী সর্বনাশ! কী ভয়ংকর ব্যাপার!"

মামা মাথা নাড়লেন, বললেন, "না নাজুবু এটা আসলে ভয়ংকর ব্যাপার না। আমার জন্যে এটা ছিল আশীর্বাদ। গড'স ব্লেসিং।"

আম্মু বললেন, "তোকে চাকু মেরে দিল, সেটা আশীর্বাদ হয় কেমন করে?"

"হয় নাজুবু। হয়। শোন—আমি বলছি। আমার জ্ঞান হয়েছে হাসপাতালে। চারিদিকে ডাক্তার আর নার্স। যখন চোখ মেলে তাকিয়েছি তখন একজন ডাক্তার বলল, ইউ আর দা লাকিয়েস্ট ম্যান অন আর্থ—তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ!" রিয়াজ মামা চোখ বড় বড় করে বললেন, "চিন্তা করো ব্যাপারটা, আমি চাকু খেয়ে প্রায় মরে যাচ্ছি আর ডাক্তার বলে আমি নাকি লাকি মানুষ। চিঁ চিঁ করে বললাম, কেন? লাকি কেন? ডাক্তার বলল চাকুটা নাকি হার্টের এক মিলিমিটার কাছে এসে থেমে গেছে—আর এক সেন্টিমিটার গেলেই আমি শেষ! খোদা নিজ হাতে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।"

রিয়াজ মামা এবারে একটু গম্ভীর হয়ে গেল, মাথা নেড়ে বলল, "তখন

www.MurchOna.com

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি আমার পুরো জীবনটার কথা চিন্তা করলাম। কী দেখলাম জান?"

আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, "কী?"

"আমি দেখলাম আমার পুরো জীবনটা কাটিয়েছি একেবারে ছাগলের মতো! আমার ভিতরে অহংকার, আমি কোনোদিন অন্য মানুষকে মানুষ হিসাবে গণ্য করি নাই। আমার মতো স্বার্থপর ছোটলোক খোদার দুনিয়ায় আর একটাও নাই। সোজা কথায় আমি হচ্ছি বেকুবের বেকুব। ঐ হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম যখন আমি হাসপাতাল থেকে বের হবো, আমি একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যাব।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী রকম মানুষ, মামা?"

"ঠিক করলাম যতদিন বেঁচে থাকব নিজের জন্যে আর কিছু করব না, যা করার অন্যের জন্যে করব! সাথে সাথে জীবনটা অন্যরকম হয়ে গেল! বেঁচে থাকা যে এত মজা আমি আগে টের পাই নাই।"

রাজু বলল, "তুমি নিজের জন্যে কিছু কর না?"

রিয়াজ মামা বললেন, "নাহ্!"

"এই যে এখন খাচ্ছ?"

রিয়াজ মামা হা হা করে হাসলেন, বললেন, "তা ঠিক। নিজের জন্যে খাই, বাথরুম করি! একটা চাকরিও করি—ব্যাস ঐ পর্যন্তই! আর কিছু করি না।"

আমি বললাম, "তুমি আমাদের বাসায় থেকে যাও মামা। তাহলে সব সময় আমার হোম ওয়ার্ক করে দিতে পারবে। তোমারও আনন্দ হবে—আমারও আনন্দ হবে।"

সবাই হো হো করে হেসে উঠল, আম্মু বললেন, "আইডিয়াটা খারাপ না। থেকে যা এই খানে—আমাদের সবার কাজ কর্ম করে দিতে পারবি!"

রিয়াজ মামা বললেন, "বেশি বলো না, তাহলে সত্যিই থেকে যাব! জায়গাটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। কী সুন্দর, নিরিবিলি। বর্ষাকালে যখন হাওরে পানি আসবে তখন যে কী সুন্দর লাগবে।" আমার আর রাজুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোরা সাঁতার জানিস তো?"

আমি আর রাজু মাথা নাড়লাম, "নাহ্। জানি না।"

রিয়াজ মামা আঁতকে উঠলেন, "সাঁতার জানিস না? তাহলে হাওরে সাঁতরাবি কেমন করে?"

আমি বললাম, "সাঁতরাব না। দূর থেকে দেখব।"

www.MurchOna.com

"ধুর বোকা! দূর থেকে হাওর দেখার কোনো মজা নাই। চল কালকেই তোকে সাঁতার শিখিয়ে দেবো।"

"কোথায় শেখাবে মামা?"

"বাংলাদেশে আবার পানির অভাব আছে নাকি? খুঁজে খুঁজে একটা পুকুর বের করে ফেলব।"

আব্বু বললেন, "হ্যাঁ রিয়াজ, দেখি তুমি আসলেই এই দুইজনকে সাঁতার শেখাতে পার কি না!"

রিয়াজ মামা বললেন, "আপন চিন্তা করবেন না দুলাভাই! কাল থেকেই শুরু করে দেবো।"

পরদিন সকালে দেখা গেল রাজুর ঠাণ্ডা লেগেছে, নাক বন্ধ এবং খক খক করে কাশছে। সাঁতার শেখার প্রোগ্রাম প্রায় বন্ধ হবার অবস্থা কিন্তু রিয়াজ মামা পেছানোর মানুষ না, বললেন, "ঠিক আছে আজকে আমি আর লিটু জায়গাটা সার্ভে করে আসি। রাজুর কাশি কমলে তাকে নিয়ে যাব।"

সকালবেলাই রিয়াজ মামা আমাকে নিয়ে বের হলেন। বাসা থেকে বের হয়ে রাস্তায় একটা রিকশা নিলেন, রিকশাওয়ালা বলল, "কোথায় যাবেন?"

মামা বললেন, "চলেন, যেখানে আপনার ইচ্ছা।"

রিকশাওয়ালা দাঁত বের করে হেসে আমাদের নিয়ে রওনা দিল। দোকানপাট পার হয়ে বাড়িঘর পার হয়ে আমরা ছোট ছোট অলিগলি দিয়ে যেতে লাগলাম। রিয়াজ মামা আমেরিকার গল্প করছেন। আমেরিকার মানুষ কেমন করে একই সাথে বোকা আর বুদ্ধিমান হয় তার গল্প, "বুঝলি লিটু, এরা স্পেস শাটল বানিয়ে ফেলতে পারে, এস্ট্রোনটদের সেই স্পেস শাটলে করে আকাশে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এরা কলা খাবার সময় কী করে জানিস?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী করে?"

"কলার পুরা ছিলকেটা খুলে ফেলে দেয়। তারপর উদোম কলাটার পেটের মাঝে চেপে ধরে খায়!"

দৃশ্যটার কথা চিন্তা করেই আমি হি হি করে হাসতে লাগলাম, রিয়াজ মামা তখন হঠাৎ রিকশাওয়ালকে বললেন, "থামান রিকশা।"

রিকশা থামল, তাকিয়ে দেখি সত্যি সত্যি সামনে একটা বিরাট পুকুর। পুকুরের বাঁধানো ঘাট, কালচে সবুজ পানি। পুকুরঘাটে একজন মহিলা কাপড় ধুচ্ছে, দুইজন গা রগড়ে রগড়ে গোসল করছে। রিয়াজ মামা রিকশা বিদায় করে

www.MurchOna.com

দিয়ে আমাকে বললেন, "কী সুন্দর পুকুর দেখেছিস?"

আমি মাথা নাড়লাম। রিয়াজ মামা বললেন, "বড় পুকুরকে বলে দিঘী। এটা নিশ্চয়ই দিঘী।"

"বড় দিঘীকে তাহলে কী বলে মামা?"

"তা তো জানি না! নিশ্চয়ই মেগা-দিঘী!"

পুকুর ঘাটে জুতো খুলে রিয়াজ মামা কিছুক্ষণ পা ভিজিয়ে বসে থাকলেন, তারপরে বললেন, "পানিটা দেখে লোভ হচ্ছে। আয় নামি।"

আমি বললাম, "তারপর ভিজে কাপড় বদলাব কী দিয়ে।"

"বদলাতে হবে না। শরীরেই শুকিয়ে যাবে! আয়।"

মামা তার টি শার্ট খুলে গেঞ্জি খুলে পুকুরে নেমে বললেন, "আয় লিটু, তোর সাঁতারের ট্রেনিং শুরু হয়ে যাক।"

আমি জুতো-মোজা খুলে, শার্ট-গেঞ্জি খুলে সাবধানে রিয়াজ মামার হাত ধরে পানিতে নেমে এলাম, ঠাণ্ডা পানিতে শরীরটা একদিকে কেমন জানি কেঁপে উঠল, সাথে সাথে মনে হলো আমি বুঝি হালকা হয়ে গেছি। এমন বিচিত্র অনুভূতি আমার জীবনে হয় নি। রিয়াজ মামা আমাকে ধরে রেখে বলেন, "বুঝলি লিটু, আমাদের আসলে পানির সাথে অন্যরকম সম্পর্ক! আমাদের শরীরের সত্তর ভাগ হচ্ছে পানি! সময় পেলেই আমাদের পানিতে ডুবে থাকা উচিত!"

বলে মামা আমাকে ধরে রেখে পানিতে ডুবে গেলেন! খানিকক্ষণ পর ভুস করে বের হয়ে বললেন, "সাঁতার শিখতে হলে প্রথমে ডুব দেয়া শিখতে হবে! আর তোকে প্রথমে ডুব দেয়া শেখাই!"

প্রথম প্রথম আমার খুব ভয় করছিল, মনে হচ্ছিল এই বুঝি ডুবে যাব কিন্তু রিয়াজ মামা আমাকে শক্ত করে ধরে রাখলেন। ধীরে ধীরে আমার ভয়টা কেটে গেল, আমি শেষপর্যন্ত পুকুরের পানিতে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করতে শুরু করলাম।

কতক্ষণ পানিতে ডুবে ছিলাম জানি না, এক সময়ে দেখি আমার সবগুলো আঙুল একেবারে কিসমিসের মতো শুকিয়ে গেছে। শুধু তাই না চারপাশে কেমন যেন ধোঁয়া ধোঁয়া দেখাচ্ছে। রিয়াজ মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আজকের মতো ট্রেনিং শেষ। তোর দুই চোখ এখন টমেটোর মতো লাল হয়ে আছে।"

আমি বললাম, "আর একটু মামা! আর একটু!"

রিয়াজ মামা বললেন, "নাহ্! একদিনে বেশি করে ফেলা ঠিক হবে না!"

আমরা দুজন তখন পুকুর থেকে উঠে এলাম, রিয়াজ মামা বললেন,

"আমাদের জুতো জামা শার্ট এখানে রেখে গিয়েছিলাম না?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

"তাহলে সেগুলি গেল কোথায়?"

আমি আর রিয়াজ মামা খামোখাই এদিক-সেদিক খুঁজে দেখলাম, কোথাও নেই। পুকুর ঘাটে একজন মেয়ে কাপড় কাচছিল, আমাদের ইতি-উতি খুঁজতে দেখে বলল, "কী খোঁজো?"

"আমাদের শার্ট-জুতো, কোথায় গেছে?"

মেয়েটা একটু রেগে উঠে বলল, "এইরকম বেহুশ হয়ে পানির মাঝে দাপাদাপি করো যে জামা-কাপড় চোরে নিয়ে যায়, তোমরা টের পাও না?"

অত্যন্ত সত্যি কথা, মনে হয় আসলেই বেহুশ হয়ে পানিতে দাপাদাপি করছিলাম, আমার এমন মেজাজ খারাপ হলো যে বলার মতো নয়। আমার সবচেয়ে সুন্দর শার্টটা তুলে নিয়ে গেছে।

রিয়াজ মামাকে অবশ্যি বেশি বিচলিত হতে দেখলাম না, হাত দিয়ে চুলের পানি চিপে বের করতে করতে বললেন, "আয় যাই। এই শার্ট-জুতো আর খুঁজে পাব না!"

আমি শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললাম, "কেমন করে যাব মামা?"

"কেমন করে আবার? হেঁটে। শার্টের পকেটে আমার মানি ব্যাগ ছিল, সেটাও নিয়েছে।"

"কিন্তু..." আমি আপত্তি করার চেষ্টা করলাম।

"কিন্তু কী?"

"খালি গায়ে আমরা যাব কেমন করে?"

"কেন অসুবিধে কীসের? এই দেশের কত মানুষ খালি গায়ে থাকে দেখিস না?"

আমি আবার বলার চেষ্টা করলাম, "কিন্তু..."

"কিন্তু কী?"

"কেউ যদি দেখে ফেলে?"

রিয়াজ মামা হেসে ফেললেন, বললেন, "দেখলে দেখবে। যারা তোকে চিনে না তারা তোকে দেখে কী ভাবল তাতে কিছু যায় আসে না। আর যারা তোকে চিনে তারা তো তোকে চিনেই, তারা কী আর তোকে পাগল ভাববে? বুঝে নেবে কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে?"

কাজেই রিয়াজ মামার সাথে খালি গায়ে ভেজা প্যান্ট, ভেজা চুল, ভেজা শরীর

www.MurchOna.com

এবং খালি পায়ে হাঁটতে শুরু করলাম। সব লোকজন চোখ বড় বড় করে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল, আমার এত অস্বস্তি লাগছিল যে সেটা বলার মতো না। খালি মনে হচ্ছিল এক্ষুনি ক্লাশের কোনো ছেলে কিংবা মেয়ের সাথে আমার দেখা হয়ে যাবে আর সে চোখ কপালে তুলে বলবে, "খালি পায়ে খালি গায়ে তুই কোথায় যাচ্ছিস?"

রিয়াজ মামা অবশ্যি খুবই সহজভাবে হেঁটে হেঁটে আসতে লাগলেন, খানিকদূর হেঁটে বললেন, "একটা জিনিস লক্ষ করেছিস লিটু?"

আমি বললাম, "কী মামা?"

"জুতো পরে পরে আমাদের পায়ের তলা একেবারে ছোট বাচ্চার গালের মতো নরম হয়ে গেছে। হাঁটতে গেলে পায়ের নিচে রীতিমতো খোচা লাগছে। তাই না?"

আমি মাথা নাড়লাম। রিয়াজ মামা বললেন, "এখন থেকে আমাদের খালি পায়ে হাঁটা প্র্যাকটিস করতে হবে। পায়ের তলা হতে হবে গণ্ডারের চামড়ার মতো শক্ত। কী বলিস?"

আমি কিছুই বললাম না, পরিচিত কারো সাথে দেখা হয়ে যায় কি না সেটা চোখের কোনা দিয়ে এদিক-সেদিক দেখতে দেখতে মাথা নিচু করে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম।

বাসায় আসার পর আম্মু আমাদের এই অবস্থা দেখে হাসবেন না কাঁদবেন বুঝতে পারলেন না। আর কখনো আমাদের একা একা বের হতে দেবেন না বলে খানিকক্ষণ চঁচামেচি করলেন। রাজুর খুব মন খারাপ হলো যে সে এরকম খালি গায়ে হেঁটে হেঁটে আসতে পারল না, রিয়াজ মামা রাজুকে শান্ত্বনা দিলেন। বললেন, "তুই কোনো চিন্তা করিস না! তোকে নিয়ে যেদিন যাব দেখিস সেদিন শুধু শার্ট না, প্যান্ট পর্যন্ত চুরি হয়ে যাবে! তখন তুই একেবারে পুরোপুরি ন্যাংটো হয়ে হেঁটে আসতে পারবি।"

পরের দিন স্কুল থেকে এসে আবার আমরা সাঁতার শিখতে গেলাম। রাজু আজকেও খক খক করে কাশছে তাই আবার আমি আর রিয়াজ মামা। আজকে আমরা আমাদের জামা-কাপড় চোখে চোখে রেখেছি বলে চোরে নিতে পারল না। আমি দুই দিনে মোটামুটি পানিতে ভেসে থাকা শিখে গেছি। রিয়াজ মামা কোনো রকম পানি না ছিটিয়ে একেবারে মাছের মতো সাঁতার কাটতে পারেন, আমি ভেসে থাকতে চাইলে চারপাশে পানির একটা বিশাল ঝাপটার তৈরি হয়—এটাই হচ্ছে

www.MurchOna.com

পার্থক্য! রিয়াজ মামা অবশ্যি এতেই খুশি, একবার পানিতে ভেসে থাকা শিখে গেলে বাকিটুকু নাকি শুধু প্র্যাকটিস!"

আমরা যখন হেঁটে হেঁটে আসছি তখন রিয়াজ মামা বললেন, "এতক্ষণ সাঁতার কেটে পেটে খিদে লেগে গেছে। আয় কিছু একটা খাই।"

আমি বললাম, "কী খাবে মামা?"

"আয় দেখি ভালো রেস্টুরেন্ট আছে কি না।"

রাস্তার পাশে একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট দেখে মামা আমাকে নিয়ে ঢুকে গেলেন। কোথাও না বসে একটু ভেতরের দিকে হেঁটে গিয়ে রেস্টুরেন্টের রান্নাঘরে উঁকি দিলেন। রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার এসে অবাক হয়ে বলল, "কী চান ভাই?"

"আমরা কিছু খাব।"

"তাহলে আসেন, বসেন।"

রিয়াজ মামা বললেন, "কিন্তু কী খাব আমি সেটা একটু দেখতে চাই।"

"মেনু দেখে অর্ডার দেন—"

রিয়াজ মামা মাথা নাড়লেন "নাহ্! খাবারটা কীভাবে রান্না করেন সেটা দেখতে চাই। বলে আবার রান্না ঘরে মাথা ঢুকিয়ে দিলেন, আমিও একটু উঁকি দিলাম। ভেতরে যা নোংরা সেটা আর বলার মতো না! একটা চুলায় একজন রান্না করছে লোকটা টপ টপ করে ঘামছে, দেখে মনে হয় খাবারের ওপরেই। মেঝেতে নানা রকম ময়লা, আমাদের সামনেই কয়টা তেলাপোকা উড়ে গেল। মামা মাথা নেড়ে আমাকে বললেন, "আয় যাই।"

আমি বললাম, "খাবে না?"

মামা বললেন, "মাথা খারাপ? এখানে খেয়ে মারা পড়ব নাকি?"

"তোমার না খিদে পেয়েছে?"

"অন্য কিছু খাব।" বলে রিয়াজ মামা আমার হাত ধরে বের হয়ে এলেন।

বের হয়ে কয়েক পা যেতেই মামা দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি বললাম, "কী হলো?"

"এই দ্যাখ।"

আমি কী দেখব বুঝতে পারলাম না। রিয়াজ মামা তখন আঙুল দিয়ে দেখালেন, রাস্তার পাশে একটা মহিলা কড়াইয়ে রুটি সেঁকছে। কয়েকটা রিকশাওয়ালা তাদের রিক্সাকে দাঁড়া করিয়ে পথের পাশে বসে মহানন্দে খাচ্ছে। রিয়াজ মামা বললেন, "আয় খাই।"

আমি অবাক হয়ে বললাম," "কী খাবে মামা?"

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

"রুটি আর সিদ্ধ ডিম।"

"কোথায়?"

"এই তো এইখানে।"

"এ-এই খানে?" আমি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে রিয়াজ মামার দিকে তাকালাম। "এইখানে?"

"হ্যাঁ। চাইনিজ রেস্টুরেন্ট থেকে এইটা একশগুন বেশি স্বাস্থ্য সম্মত! একেবারে আমার চোখের সামনে রুটিটা গনগনে আগুনে সেঁকা হচ্ছে, এর মাঝে কোনো ব্যাক্টেরিয়া নাই।"

"কিন্তু মামা..."

"এর মাঝে কোনো কিন্তু নাই। ব্যাক্টেরিয়া আর জার্মের ওপর আমার কয়টা পেপার আছে তুই জানিস? এইখানে বসে খেলে এই লোকগুলোর সাথে গল্পও করতে পারব। ভেরি ইন্টারেস্টিং হবে সেটা!"

কাজেই রিয়াজ মামার সাথে গিয়ে আমার রাস্তার পাশে বসতে হলো। যে মহিলাটি রুটি সেঁকছিল এবং যারা খাচ্ছিল তারা আমাদের বসতে দেখে এত অবাক হলো যে সেটা বলার মতো নয়। রিয়াজ মামা অবশ্যি এমন ভাব করতে লাগলেন যে ভালো কাপড়-জামা পরা রীতিমতো একটা ভদ্রলোকের রাস্তার পাশে রিকশাওয়ালাদের সাথে বসে খাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার!

রিয়াজ মামা খুব তৃপ্তি করে খেলেন, আমি খাওয়ার চেষ্টা করলাম, শুকনো রুটি সিদ্ধ ডিম গলা দিয়ে কেন জানি ঢুকতে চাইল না। সারাক্ষণই আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আমার ক্লাশের কোনো ছেলে-মেয়ে আমাকে দেখে ফেলবে—আর অবাক হয়ে বলবে, "লিটু! তুমি এখানে কী করছ?"

রিয়াজ মামার অবশ্যি মোটেই অস্বস্তি হচ্ছিল না, রিকশাওয়ালাদের সাথে গল্প করছিলেন এবং এক সময় দেখলাম, মহিলার সাথে খাতির জমিয়ে তার রুটিগুলো বেলার চেষ্টা করলেন। সেগুলো গোল না হয়ে বাঁকাতেড়া হতে লাগ এবং সেটা দেখে মহিলা হি হি করে হাসতে লাগল। তখন রিয়াজ মামা রুটি বেলার দায়িত্বটা ছেড়ে রুটি সেঁকা শুরু করলেন। তার ভাব দেখে মনেই হলো না এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার!

রিয়াজ মামা আমাদের সাথে দিন দশেক ছিলেন। আমরা তাকে আরো কয়দিন থাকতে বলেছিলাম, মামাও চাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ ঢাকা থেকে তার একটা টেলিফোন এলো, প্লেনের টিকেট নিয়ে একটা জরুরি কী কাজে তাকে তখনই

www.MurchOna.com

যেতে হবে। তাই রিয়াজ মামা চলে গেলেন আর চলে যাবার সময় আমাদের সবারই খুব মন খারপ হলো। আমরা তার কাছ থেকে কথা আদায় করিয়ে নিলাম যে মামা আবার বেড়াতে আসবেন। আর যখন আবার আসবেন তখন অনেক দিন থাকবেন।

রিয়াজ মামা চলে গেলেন ঠিকই কিন্তু যাবার আগে আমাকে অনেকগুলো জিনিস শিখিয়ে দিয়ে গেলেন। তার এক নম্বর হচ্ছে সাঁতার—আমি এখন একেবারে পানির পোকার মতো সাঁতার কাটতে পারি! শুধু যে পারি তা না—ঘণ্টার পর ঘণ্টা পানিতে ভেসে থাকতে পারি, আমার এতটুকু পরিশ্রম হয় না। রিয়াজ মামা আমাকে দুই নম্বর জিনিস যেটা শিখালেন সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান! আম্মু বলেছেন রিয়াজ মামা নাকি অনেক বড়—যাকে বলে একেবারে ফাটাফাটি ধরনের বিজ্ঞানী কিন্তু মামা একবারও সেগুলো নিয়ে কথা বলেন নাই। কিন্তু বিজ্ঞান জিনিসটা কী নিজের কাজকর্ম দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন! তাই চাইনিজ রেস্টুরেন্টে বসে খেতে রাজি হন না কিন্তু রাস্তার পাশে বসে রুটি খেতে তার কোনো সমস্যা হয় না। রিয়াজ মামা ঘরে ফিরে বলতেন সবাইকে বিজ্ঞানী হতে হবে না কিন্তু সবাইকে বিজ্ঞানীর মতো চিন্তা করতে হবে, কেউ উল্টাপাল্টা চিন্তা করতে পারবে না! রিয়াজ মামা আমাকে তিন নম্বর যেটা শিখিয়েছেন সেটা হচ্ছে কে কী ভাবছে সেটা নিয়ে মাথা না ঘামাতে! অনেকবার আমাকে বলেছেন, "বুঝলি লিটু, যারা তোকে চিনে না তারা তোকে পাগল ভাবে না ছাগল ভাবে তাতে কিছু আসে যায় না। আর যারা তোকে চিনে তারা তো জানেই তুই কতটুকু পাগল আর কতটুকু ছাগল—তাই খামোখা কোনো কিছু নিয়ে ভান করবি না, যেটা করতে চাস সেটা করে ফেলবি!" মামা চার নম্বর জিনিস যেটা শিখিয়েছেন সেটা হচ্ছে কখনো রাগ না হতে! যখনই খুব রাগ হবে তখন খিক খিক করে হেসে ফেলতে! এটা অবশ্য আমি এখনো পরীক্ষা করে দেখতে পারি নাই। আমার মনে হয় পরীক্ষা করতেও পারব না। কারণ আমার যখন খুব রাগ ওঠে তখন আমার ব্রেন শর্ট সার্কিট হয়ে যায়, এবং আমার চোখে পানি এসে যায়, তখন কোনোমতেই আমি খিক খিক করে হাসতে পারব না। রিয়াজ মামার কাছে আমি টাকা কেটে জোড়া দেয়ার একটা ম্যাজিকও শিখেছি, ম্যাজিকটা খুবই মজার কিন্তু সেটা বেশি দেখানো যাবে না, কারণ টাকাগুলি আসলে জোড়া লাগে না! রিয়াজ মামা আরো কিছু গোপন জিনিস শিখিয়ে দিয়েছেন কিন্তু সেগুলি কাউকে বলা যাবে না। কাউকে না!

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

৪.

আমি স্কুলে গিয়েছি তখন কোথা থেকে জানি মাধুরী ছুটে এসে বলল, "এই লিটু শোন।"

আমি বললাম, "কী হয়েছে?"

"রতনকে নিয়ে আর পারি না।"

"কেন কী হয়েছে?"

"এত বড় মিথ্যুক তুই চিন্তা করতে পারবি না।"

"কী মিথ্যা বলেছে?"

মাধুরী বলল, "বলেছে তুই নাকি খালি পায়ে আর খালি গায়ে সারা শহর ঘুরে বেড়াস। সে নাকি নিজের চোখে দেখেছে!"

আমি হি হি করে হেসে উঠলাম। মাধুরী রেগে উঠে বলল, "তুই হাসছিস? এটা হাসির কথা হলো? প্রত্যেকদিন বানিয়ে বানিয়ে একটা কথা বলবে আর আমাদের সেটা শুনতে হবে?"

এরকম সময় সুমন এসে হাজির হলো, জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে রে?"

"কিছু হয় নাই।" মাধুরী মুখ বাঁকা করে বলল, "রতনের কথা বলছিলাম, আবার বানিয়ে বানিয়ে গালগল্প ছাড়ছে।"

সুমন মুখ শক্ত করে বলল, "রতনকে সাইজ করার একটা মাত্র উপায়।"

"সেটা কী?"

"ধরে আচ্ছা করে বানানো। এমনভাবে একদিন বানিয়ে দেবো যে সাইজ হয়ে যাবে।"

রতনের কপাল খারাপ, ঠিক এই সময় সে হেলতে দুলতে ক্লাশ রুমে ঢুকছিল। সুমন তাকে দেখে এগিয়ে গেল, "এই রতন! তুই এদিকে আয়—"

সুমনকে দেখে রতন রীতিমতো ঘাবড়ে গেল, ভয়ে ভয়ে বলল, "কী হইছে?"

www.MurchOna.com

সুমন বলল, "তোকে এখন সাইজ করার সময় হয়েছে—"

আমি থামালাম, বললাম, "দাঁড়া দাঁড়া! এইবার সাইজ করিস না!"

"কেন? কেন সাইজ করব না। যা খুশি তাই বলে বেড়াবে—"

মাধুরী বলল, "তাও যদি বিশ্বাসযোগ্য কোনো কথা হতো! উল্টাপাল্টা—"

আমি বললাম, "আগে আমার কথা শোন! রতন বানিয়ে বলে নাই। আমি আসলেই খালি পায়ে খালি গায়ে সারা শহর চক্কর দিয়েছি!"

যারা ছিল তারা সবাই চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকালো, "সত্যি?"

"সত্যি!"

"কেন?" মাধুরী তখনো বিশ্বাস করতে পারছিল না। বলল, "তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

"না, আমার মোটেও মাথা খারাপ হয় নাই।" কী হয়েছে সেটা আগে শোন। আমি তখন আমার সাঁতার শেখার কাহিনী, কাপড় চুরি হবার কাহিনী আর খালি পা এবং খালি গায়ে বাসায় ফিরে আসার কাহিনী শোনালাম।

সবাই যখন হি হি করে হাসছে, তখন রতন মুখ শক্ত করে বলল, "এখন সবাই দাঁত কেলিয়ে হাসিস! আর আমি যখন কইলাম তখন কেউ হাসলি না। সবাই মুখটা ভোতা কইরা রাখলি!"

সুমন রতনের পিঠে থাবা দিয়ে বলল, "তুই রাখাল বালকের "বাঘ আসিয়াছে" গল্প শুনিস নি? এটাও সেরকম! তুই এমন গুল পট্টি মারিস যে সত্যি কথা বললেও সেটাকে সবাই মনে করে গুলপট্টি!"

রতন চোখ গরম করে বলল, "এখন তো তোরা কেউ আমার কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছিস না, একদিন বুঝবি মজা!" তারপর সে গটগট করে হেঁটে চলে গেল।

নূতন জায়গায় গেলে সেখানকার ছেলে-মেয়ের সাথে পরিচয় হতে একটু সময় লাগে, কিন্তু রতনের নানা রকম পাগলামোর জন্যেই মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি আমার ক্লাশের প্রায় সবার সাথে পরিচয় আর বেশ অনেকের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। রতন যে-রকম বলেছিল সাদিব আসলেই সেরকম ভালো ছাত্র কিন্তু মোটেও সব সময় সব কিছু মুখস্ত করে ফেলা ভালো ছাত্র না—সত্যিকারের ভালো ছাত্র। ভালো ছাত্রদের যেরকম "আমি কী হনুরে" একটা ভাব থাকে, সাদিবের মোটেও সেরকম ভাব নাই। সে খুবই ভালো মানুষ। সুমনের সাথে উল্টাপাল্টা কিছু করলে সত্যি সত্যি মার খাওয়ার একটা ভয় আছে, তবে রতন যে-রকম বলেছিল—তার টি.এন.ও. বাবা পুলিশ বিডি আর পাঠিয়ে মার দেবে তা নয়,

সুমন নিজেই দেবে! সে মানুষটা ছোটখাটো হলেও তার হাতে, পায়ে, ঘাড়ে কিলবিলে মাসল! মাধুরীর গানের গলা পরীদের মতো সুন্দর সেটা অনেকেই বলেছে কিন্তু সেটা এখনো শুনি নি। সে যেভাবে সারাক্ষণ চ্যাটাং চ্যাটাং করে কথা বলে তাতে কিন্তু একেবারেই মনে হয় না এই গলা দিয়ে গান বের হতে পারে। এদের ভিতরে তানিয়া সবচেয়ে চুপচাপ, তার মনটাও খুব নরম। রতনের কথা খুব ভুল না, তানিয়ার ভিতরে একটা মাদার টেনিয়া মাদার টেনিয়া ভাব আছে। মোট কথা ক্লাশের একেকজন ছেলে মেয়ে, একেকরকম, তাদের সবার সাথেই বেশ তাড়াতাড়ি আমার এক ধরনের সম্পর্ক হয়ে গেল।

তবে স্যার আর ম্যাডামদের কথা আলাদা। আমাদের ক্লাশ টিচার বেলা আপা, খুব হাসি-খুশি মানুষ, ইংরেজি স্যার একটু গম্ভীর ধরনের কিন্তু মানুষটা খারাপ না। বিজ্ঞানের ম্যাডাম একটু নার্ভাস টাইপের কিন্তু সবচেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে রাক্ষস স্যার। আসল নাম আক্কাস আলী সবাই ডাকে রাক্ষস আলী। আসলেই রাক্ষসের মতো ভয়ংকর। ক্লাশে এসে বোর্ডে অঙ্ক বই থেকে কয়েকটা অঙ্ক লিখে বলেন, "মুখস্ত কর!"

মানুষ কেমন করে অঙ্ক মুখস্ত করবে? অঙ্ক কি একটা মুখস্ত করার জিনিস? যারা কবিতা আবৃত্তি করে তারা কবিতা মুখস্ত করতে পারে যারা গান গায় তারা গান মুখস্ত করতে পারে তাই বলে অঙ্ক? আমি জানি এই স্যারের নাম রাক্ষস স্যার, রাক্ষসের মতো একজনকে ধরে কাঁচা খেয়ে ফেলতে পারেন তারপরও আমি আরেকদিন জিনিসটা থামানোর চেষ্টা করলাম। রাক্ষস স্যার বোর্ডে অঙ্কগুলো লিখে দেওয়ার পর আমি হাত তুলে বললাম,"স্যার।"

স্যার ভুরু কুচকে আমার দিকে তাকালেন, মনে হলো হাতের ডাস্টারটা আমার দিকে ছুড়ে মারবেন কিন্তু শেষপর্যন্ত মারলেন না, নাক দিয়ে ফোঁত করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "কী?"

"অঙ্ক মুখস্ত করতে পারি না স্যার। ক্লাশে অঙ্কগুলো বুঝিয়ে দিলে..."

স্যারের মুখটা শক্ত হয়ে গেল, আমার আবার মনে হলো স্যার বুঝি ডাস্টারটা আমার মাথার দিকে ছুড়ে মারবেন, আমি সাবধান থাকলাম, যদি সত্যিই মেরে বসেন তাহলে যেন সরে যেতে পারি কিংবা ক্যাচ ধরে ফেলতে পারি।

স্যারের মুখটা কেমন জানি বীভৎস রকম তেলত্যালে হয়ে গেল, সেই রকম অবস্থায় বললেন, "ক্লাশে বুঝিয়ে দেবো?"

"জি স্যার?"

"আর কী কী করতে হবে? পিঠে তেল মালিশ করে দিতে হবে?"

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। স্যার মুখ খিচিয়ে বললেন, "বাঁদরামোর আর জায়গা পাও না? কিলিয়ে একেবারে ভর্তা করে দেবো। বদমাইস ছেলে।"

রাক্ষস স্যার ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "অঙ্ক যদি বুঝতে চাও পরীক্ষায় যদি পাশ করতে চাও তাহলে তোমার বাবারে বলো আমার কাছে প্রাইভেট পড়তে পাঠাতে। যদি সেই মুরোদ না থাকে তাহলে ক্লাশে বসে আঙুল চুষবা আর মুখস্ত করবা। বুঝেছ?"

আমি মাথা নাড়লাম, তারপর বসে পড়লাম। রাক্ষস স্যার যে ডাস্টার ছুড়ে আমার মাথাটা ফাটিয়ে দেন নাই মনে হলো সেই জন্যেই স্যারের হাত ধরে সেখানে একটা চুমো খেয়ে আসি।

টিফিন ছুটিতে সুমন বলল, "তোর সাহস তো কম না-তুই রাক্ষস স্যারের সাথে তর্ক করিস! তোকে যে কাঁচা খেয়ে পেলেন নাই সেইটাই বেশি!"

আমি বললাম, "কিন্তু স্যার কী বলেছে শুনেছিস?"

"প্রাইভেট পড়ার কথা?"

"হ্যাঁ"

সাদিব বলল, "এইটা আর নূতন কী? স্যার তো অনেক আগেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছে, তার কাছে প্রাইভেট না পড়লে পরীক্ষায় ফেল!"

"সত্যি?"

"তুই শুনলি না নিজের কানে।"

সত্যি কথা—আমি নিজের কানে শুনেছি। আমি এখনো বিষয়টা হজম করতে পারছি না। মাথা নেড়ে বললাম, "এটা সহ্য করা ঠিক না।"

মাধুরী জিজ্ঞেস করল, "কোনটা সহ্য করা ঠিক না?"

"এই যে আমাদের জোর করে মুখস্ত করাচ্ছেন। তোরা জানিস না, বলা হয় মুখস্ত হচ্ছে একটা অশ্লীল শব্দ!"

সাদিব বলল, "ঠিকই বলেছিস। মানুষের ব্রেন আসলে মুখস্ত করার জন্যে তৈরি হয় নাই। তাই যখন কিছু মুখস্ত করতে হয় তখন ব্রেনের উপরে খুব চাপ পড়ে।"

আমি মুখ সূচালো করে বললাম, "কিছু একটা করা দরকার।"

মাধুরী জিজ্ঞেস করল, "কী করবি?"

"এখনো জানি না। কিন্তু কিছু একটা করা দরকার।"

আমার কথায় হঠাৎ ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। সবাই ধরেই নিয়েছিল যে

রাক্ষস স্যার সারাটা বছর আমদের উপর এই রকম অত্যাচার করবেন আর আমাদের সেটা সহ্য করতে হবে। কিন্তু আমি যখন বলেছি কিছু একটা করা দরকার তখন হঠাৎ করে সবাই কেমন জানি চনমন করে উঠল। সুমন হাতে কিল দিয়ে বলল, "ঠিকই বলেছিস! কিছু একটা করা দরকার। আমরা কি মাথার উকুন নাকি যে স্যার একজন একজন করে টিপে টিপে মারবেন?"

তানিয়া কম কথার মানুষ, সে আস্তে আস্তে বলল, "কী করবি?"

সাদিব তার চশমাটা চোখ থেকে খুলে সেটা পরিষ্কার করে বলল, "সবাই মিলে চিন্তা করলে একটা বুদ্ধি বের হয়ে যাবে।"

আমরা সবাই মিলে চিন্তা করতে লাগলাম কিন্তু কোনো ভালো বুদ্ধি বের হলো না। স্যারকে অনেক রাগিয়ে স্ট্রোক করিয়ে ফেলা, উড়ো চিঠি দিয়ে ভয় দেখানো, স্যারের ছেলেকে কিডন্যাপ করে নিয়ে মুখস্ত না করানোর মুক্তিপণ আদায়, স্যারের বিরুদ্ধে হরতাল ডেকে রাস্তায় গাড়ি ভাংচুর করা, প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্যারের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দেওয়া এইরকম আজব আর বিদঘুটে বুদ্ধি বের হতে লাগল। তখন সাদিব বলল, "পত্রিকায় স্যারের সম্পর্কে একটা খবর ছাপালে কেমন হয়?"

মাধুরী মুখ ভেংচে বলল, "ইশ! পত্রিকাগুলো রাক্ষস স্যারের খবর ছাপানোর জন্যে যেন বসে আছে! এমনি এমনি খুন হলেই পত্রিকায় খবর ছাপা হয় না, খুন করার পর লাশ ষোল টুকরো হলে তখন সেই খবরটা ছাপায়!"

তানিয়া আস্তে আস্তে বলল, "কিন্তু সাদিবের বুদ্ধিটা ভালো। এমনিতে তো খবরটা ছাপাবে না কিন্তু যদি ছাপানোর মতো একটা ঘটনা বানানো যায়?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী রকম খবর বানাবি?"

"এই মনে কর মুখস্ত করার প্রচণ্ড চাপে আমাদের কিছু একটা হয়ে গেল?"

আমি হাতে কিল দিয়ে বললাম, "ফার্স্ট ক্লাশ আইডিয়া!

সুমন বলল, "কেউ একজন ধর মাথায় রক্ত উঠে মরেই গেল!"

তানিয়া বলল, "না, না। মরতে হবে না। কিন্তু ধর কেউ যদি পাগলের মতো হয়ে যায়?"

"সেটা খারাপ বুদ্ধি না!" সুমন দাঁত বের করে হেসে বলল, "পাগল হবার ভান করে যদি একটা কিরিচ নিয়ে স্যারকে তাড়া করে, তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়।"

আমি বললাম, "ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া! বল কে পাগল হবি?"

সুমন ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি যদি পাগল হই আব্বু খবর

পেলে সাথে সাথে আমাকে চিকিৎসার জন্যে ঢাকা পাঠিয়ে সেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি করে দেবে।"

সাদিব মাথা চুলকে বলল, "আমারও একই অবস্থা। বাসায় খবর গেলে আমার আম্মুর হার্টফেল হয়ে যাবে।"

মাধুরী বলল, "আমি বাবা একটিং করতে পারব না। আমার হাসি উঠে যাবে।"

তানিয়া বলল, "আমিও পারব না।"

সবাই তখন আমার দিকে ঘুরে তাকাল, বলল, "তুই!"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "আমি?"

অন্যেরা চাপাচাপি করতে চাচ্ছিল ঠিক তখন রতন এসে হাজির হয়ে গেল বলে সবাই চুপ করে গেল! রতন বলল, "আমারে নিয়ে মশকরা করছিস।"

সাদিব বলল, "না, তোকে নিয়ে মশকরা করছি না।"

"নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে মশকরা করছিস। তা না হলে আমি আসা মাত্র কথা বন্ধ করলি কেন?"

সুমন মাথা নাড়ল, "না না রতন। আমরা তোকে নিয়ে মশকরা করছি না। অন্য কিছু নিয়ে কথা বলছি।"

"কী নিয়ে কথা বলছিস?"

সাদিব বলল, "না, মানে ইয়ে..."

"বল আমারে কী নিয়ে কথা বলছিলি।"

মাধুরী বলল, "সব কথা তোর শুনতে হবে কেন?"

রতন আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোরা সবাই মিলে একটা কথা আলাপ করতে পারস, কিন্তু সেটা আমি শুনতেও পারমু না! আমি তোদের লগে পড়ি না? আমি রাস্তা থেকে আসছি? নাকি জঙ্গল থেকে আসছি?" রতন গলার স্বর উঁচু করে এমন জোরে চেঁচামেচি শুরু করল যে সবাই আমাদের দিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল!

সুমন চাপা স্বরে বলল, "আস্তে রতন, আস্তে! চেঁচাবি না। বলছি তোকে।"

রতন বলল, "বল তাহলে?"

সাদিব বলল, "কাউকে বলবি না, খবরদার। জানাজানি হয়ে গেলে কিন্তু বিপদ।"

রতনের চোখ চকচক করে ওঠে। কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, "খোদার কসম আল্লাহ্‌র কীরা। এক মানুষ এক জবান—কথা কইলে কাটা গর্দান।"

www.MurchOna.com

"আমরা রাক্ষস স্যারকে সাইজ করার একটা প্ল্যান করছি।"

"কী প্ল্যান, আমারে বল।" আনন্দে রতনের সবগুলো দাঁত বের হয়ে যায়, "একটা বস্তায় ঢুকাইয়া স্যাররে সেন্ট মার্টিন্সে কুরিয়ার কইরা দেই!"

আমি বললাম, "না রতন, ঠাট্টা না। আমরা সিরিয়াস কথা বলছি।"

রতন রাগ রাগ মুখে বলল, "আমি কি ঠাট্টা করছি নাকি?"

সুমন বলল, "আমরা প্ল্যান করেছি আমাদের একজন ভান করবে, স্যারের মুখস্তের ঠেলায় একজন পাগল হয়ে গেছে— সেটা খবরের কাগজে ছাপা হবে..."

রতন হাতে কিল মেরে বলল, "কোনদিন করতে হবে বল!"

"কোনদিন করতে হবে মানে? কে করবে? তুই?"

"আমি ছাড়া এই ক্লাশে কে আছে এই একটিং করার? দেখামু করে?"

আমরা সবাই একসাথে বললাম, "না। না—দরকার নাই!"

"এমন পাগলের একটিং করুম যে তোরা বেকুব হয়ে যাবি। জামা-কাপড় খুলে এমন লাফ দিমু..."

মাধুরী চমকে উঠে বলল, "জামা-কাপড় খুলে মানে?"

রতন চোখ মটকে বলল, "পাগলদের প্রথম কামই হচ্ছে কাপড় খুলে ফেলা। তোরা দেখস নাই?"

সাদিব বলল, "দেখেছি, কিন্তু..."

রতন বলল, "আমার এক চাচা ছিলেন। এক রাতে জিন দেখে পাগল হয়া গেলেন। তারপর থেকে পূর্ণিমার রাত হলেই সব জামা-কাপড় খুইলা বের হয়ে যেতেন।"

আমি শক্ত গলায় বললাম, "রতন।"

গলার স্বরে কিছু একটা ছিল যে রতন থতমত খেয়ে আমার দিকে তাকাল, চলল, "কী হয়েছে?"

"তুই এখন বুঝেছিস কেন তুই আসা মাত্র মুখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম? কেন তোকে কিছু বলতে চাই নাই।"

রতন বলল, "কেন?"

"তার কারণ তোর পুরা মাথা খারাপ। রাক্ষস স্যার নিয়ে আমাদের জান শেষ, সবাই মিলে একটা প্ল্যান করছি আর তুই সেটাকে নিয়ে একটা জোকারী শুরু করলি?"

রতন চোখ কপালে তুলে বলল, "জোকারী?"

"জোকারী না তো কী? তুই স্কুলের একজন ছাত্র, ন্যাংটা হয়ে লাফাবি মানে?"

www.MurchOna.com

"পাগল হতে হলে..."

"আমরা কী সেরকম পাগল বলেছি?"

"তাহলে কী রকম পাগল?"

"অঙ্ক মুখস্ত করতে করতে যার মাথা বিগড়ে গেছে, সারাক্ষণ বিড় বিড় করে অঙ্ক মুখস্ত বলে বা এই রকম কিছু।"

মাধুরী বলল, "রতন তোর এই পাগলের একটিং করতে হবে না। তুই শুধু একটা উপকার কর।"

"কী উপকার?"

"তুই এটার কথা ভুলে যা। আর খবরদার কাউকে কিছু বলবি না। যদি কথাটা কোনোভাবে রাক্ষস স্যারের কানে যায় তাহলে কেউ জানে বেঁচে থাকবে না।"

রতন গম্ভীর হয়ে বলল, "হয় আমাকে একটিং করতে দিবি আর যদি না দিস তাহলে আমি সবাইরে বলে দিমু।"

আমরা সবাই একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম। রতনের উপর এমন রাগ উঠল যে সেটা আর বলার মতো নয়। সুমন চোখ পাকিয়ে বলল, "রতন, তোকে আমি খুন করে ফেলব। এমন ধোলাই দেবো যে তোর হাড্ডি থাকবে এক জায়গায় আর চামড়া থাকবে আরেক জায়গায়।

রতন বলল, "আমি তোর ধোলাইরে ভয় পাই? তোরে আমি এমন ধোলাই দিমু..."

তানিয়া বলল, "ব্যাস অনেক হয়েছে। থাম, ঝগড়া করবি না। তোদের এই কথাগুলি শুনতে এত খারাপ লাগে, তোরা যে কেমন করে বলিস আমি বুঝতেই পারি না।"

সুমন বলল, "যখন যেটা দরকার..."

তানিয়া বলল, "কোনো দরকার নেই। চুপ কর তুই।" তারপর রতনের দিকে তাকিয়ে বলল, "শোন রতন। আমরা সবাই মিলে একটা জিনিস ঠিক করেছি, কাজেই সেটা সবার মানতে হবে। বুঝেছিস?

"বুঝেছি।"

"কাজেই তুই বলতে পারবি না যে তোকে একটিং করতে না দিলে তুই সবাইকে বলে দিবি। বুঝেছিস?"

রতন কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল। তানিয়া বলল, "কী হলো কথা বলছিস না কেন? বুঝেছিস?"

www.MurchOna.com

"বুঝলাম। কিন্তু..."

"কিন্তু কী?"

"কিন্তু আমি যদি কোনোদিন তোদের একটিং কইরা দেখাই, সেইটা যদি তোদের পছন্দ হয় তাহলে আমারে করতে দিবি।"

আমরা একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম, আমি বললাম, "ঠিক আছে আগে দেখা। তারপর দেখি। কবে দেখাবি?"

"যেদিন ইচ্ছা।"

তানিয়া বলল, "ঠিক আছে। আগে আমাদের দেখাবি, আমাদের যদি পছন্দ হয় তাহলে তুই করবি। তার আগে না।"

"ঠিক আছে!"

"কথা দিলি আমাদের?"

"দিলাম। এক কথা এক জবান। তা না হইলে কাটা গর্দান।"

মাধুরী ফোঁস করে বলল, "একটু আগেই এটা বলে পরের সেকেন্ডে সবাইকে বলে দিতে চাইলি!"

রতন বলল, "বইলা দিতে চেয়েছি। কিন্তু বলছি?"

আমরা কোনো কথা বললাম না, তানিয়া শুধু একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল।

আমরা পরের কয়েকদিন বসে বসে কয়েকটা সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করলাম। রাক্ষস স্যারের মুখস্তের চাপে একজনের মাথা বিগড়ে যাবার আগে ছোট ছোট কয়েকটা ঘনা ঘটবে। খুবই ছোট ঘটনা কিন্তু সেটা থেকেই সবাই বুঝতে পারবে রাক্ষস স্যার আমাদের ওপর এক ধরনের অত্যাচার করছেন। প্রথম ঘটনাটা হলো এরকম :

ক্লাশ টিচার বেলা আপা "একটি চাঁদনী রাত" এর ওপর একটা রচনা লিখতে দিয়েছেন, আমরা সবাই সেই রচনা লিখে জমা দিয়েছি। আপা খাতাগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ কেমন যেন চমকে উঠলেন, খাতাটা হাতে নিয়ে ভুরু কুচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। এটা যে ঘটবে আমরা কয়েকজন জানি আগে থেকে তাই চোখের কোনা দিয়ে তাকিয়ে রইলাম। আপা খাতাটা হাতে নিয়ে বললেন, "সাদিব! সাদিব কোথায়?"

সাদিব উঠে দাঁড়াল, "এই যে আপা, আমি এখানে।"

"তুমি এখানে এটা কী লিখেছ?"

"রচনা। চাঁদনী রাতের উপর রচনা।"

www.MurchOna.com

"হ্যাঁ। কিন্তু তার মাঝে হঠাৎ করে এসব কী?"

"কী আপা?"

"এই দেখো", তুমি লিখেছ, নদীর পানিতে পূর্ণিমার চাঁদটির প্রতিফলনে একটি অপরূপ ত্রিভূজের দুই বাহু এবি এবং বিসি, এবি বাহু বিসি থেকে বড় কিন্তু সেই দৃশ্য দেখে আমার মনের ভেতরে বাহুর বর্গটি ক্ষেত্রফল থেকে বেশি। এটা কী?"

অন্য যে কেউ এরকম একটা কিছু লিখলে সেটা নিয়ে হাসাহাসি হতে পারে, রাগারাগি হতে পারে কিন্তু সাদিবের কথা আলাদা! সে রচনা লিখলে সেখানে একটা বানান ভুল থাকে না। একটা কাটাকাটি থাকে না। পরীক্ষার খাতায় স্যার ম্যাডামরা সাদিবকে বিশের ভেতরে সাড়ে উনিশ নম্বর দিয়ে দেন। সেই সাদিব এরকম একটা কিছু লিখলে সবাই তো অবাক হবেই।

আপা জিজ্ঞেস করলেন, "কী লিখেছ এসব?"

সাদিব ভ্যাবাচেকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, ভান করল সে কিছুই বুঝতে পারছে না, আমতা আমতা করে বলল, "আপা ইয়ে মানে আমি ঠিক জানি না এটা কেন লিখেছি! কিন্তু মানে..."

"মানে কী?"

"মনে হয়..."

"কী মনে হয়?"

"অনেকগুলো উপপাদ্য মুখস্ত করতে হয়েছিল তখন মনে হয় কোনোভাবে— কোনোভাবে— কোনোভাবে..." সাদিব থেমে গেল।

আপা কোনো কথা না বলে কিছুক্ষণ সাদিবের দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর বললেন, "তুমি বসো।" কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে খাতাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর বললেন, "তোমাদের সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে ফেলো। একসাথে এতগুলো উপপাদ্য মুখস্ত করতে যাওয়া ঠিক না—"

সুমন বলল, "আমরা করতে চাই না আপা, কিন্তু স্যার করতে বলেন তাই করি।"

আপা বললেন, "ও।" তারপর চুপ করে গেলেন।

ক্লাশের অন্যেরা বুঝতে পারল না, শুধু আমরা কয়েকজন বুঝলাম অনেক বড় একটা কাজ করে ফেলেছি। আপা নিশ্চয়ই এই ঘটনাটা অন্য স্যার আর আপাদেরকেও বলবেন! মোটামুটি স্কুলে সবাই জেনে যাবে রাক্ষস স্যারের উৎপাতে সাদিবের মতো একটা ছাত্রের মাথা বিগড়ে যাবার অবস্থা!

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

এর পরের ঘটনাটা ঘটালাম আমি। ইচ্ছে করে একদিন হেড স্যারের মুখোমুখি হয়ে গেলাম, একটু সরে স্যারকে যাবার রাস্তা করে হাত দিয়ে সালাম করে বললাম, "সমানুপাতিক স্যার।"

হেড স্যার দাঁড়িয়ে গেলেন, বললেন, "কী বললি তুই?"

"আমি সালাম দিয়েছি স্যার।"

"সালাম দিস নি। অন্য কিছু বলেছিস। কী বলেছিস?"

আমি মাথা নাড়লাম, "না স্যার। বলেছি, স্লামালিকুম স্যার।"

"না তুই বলেছিস সমানুপাতিক স্যার। কেন বললি এটা?"

আমি মুখে ভ্যাবাচেকা খাবার একটা ভান করে দাঁড়িয়ে রইলাম, হেড স্যার ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন বললি?"

আমি ঢোক গিলে বললাম, "ইচ্ছে করে বলি নি স্যার। আসলে আমি জানি না স্যার যে এটা বলেছি। রাত জেগে এতগুলো সমানুপাতিকের অঙ্ক মুখস্ত করেছি তাই মনে হয়..."

"তাই মনে হয় কী?"

আমি কোনো কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইলাম। হেড স্যার একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "যা। আর রাত জেগে এগুলো মুখস্ত করবি না।"

আমি চলে এলাম। অন্যেরা দূর থেকে দেখছিল, আমি তাদের কাছে যেতেই তারা আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে দিল।

তৃতীয় ছোট ঘটনাটা ঘটানোর জন্যে দায়িত্ব দেয়া হলো মাধুরীকে। যখনই স্কুলে কোনো অনুষ্ঠান হয় মাধুরীকে একটা গান গাইতে হয়—ঠিক করা থাকল গানের মাঝখানে হঠাৎ করে মাধুরী একটা এলজেবরার লইন ঢুকিয়ে দেবে! অনুষ্ঠান কবে হবে তার জন্যে অপেক্ষা করছি তখন একদিন খবর পেলাম আমাদের স্কুল লাইব্রেরি উদ্বোধন করা হবে। জেলা প্রশাসক আসবেন উদ্বোধন করতে। মাধুরী ঠিক করে রাখল তাকে যখন গান গাইতে বলবে তখন সে গাইবে 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই এক্স স্কয়ার প্লাস সিক্স এক্স প্লাস এইট!' তারপর খুব লজ্জা পাবার ভান করে ঠিক করে গাইবে! আগের ঘটনাগুলোর সাথে এই ঘটনাটা যোগ করা হলে দুইয়ে দুইয়ে চারের মতো সবাই বুঝে যাবে আমাদের ক্লাশে আঙ্ক পড়ানো নিয়ে একটা খুব বড় সমস্যা আছে।

আমরা এক ধরনের উত্তেজনা নিয়ে বসে আছি। জেলা প্রশাসক এলেন, আমাদের হেড স্যার তাকে নিয়ে বসালেন। দুই-এক জন বক্তৃতা দিলো—কে যে এই বক্তৃতা জিনিসটা আবিষ্কার করেছে কে জানে। কেন একজন মানুষকে বকর

www.MurchOna.com

বকর করে কথা বলতে হবে আর কেন অন্য সব মানুষকে সেটা শুনতে হবে? যার কথা বলার ইচ্ছে সে ঘরে বসে নিজে নিজে কথা বললেই পারে। যখন কেউ বক্তৃতা শুরু করে তখন সময় আর কাটতে চায় না—আজকে অবশ্যি একটা উত্তেজনার মাঝে ছিলাম তাই সময়টা বেশ তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেল। একজন আপা ঘোষণা দিলেন এখন মাধুরী দেশাত্মবোধক গান গাইবে তখন মাধুরী হেঁটে হেঁটে স্টেজে গেল। কয়েকজন সাংবাদিকও এসেছে তারা ছবি তুলে চলে যাচ্ছিল, মাধুরীকে দেখে থামল, মনে হয় তারা গানটা শুনে যেতে চায়।

আমার পাশে রতন বসেছিল সে গলা নামিয়ে বলল, "এখন করি?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী করবি?"

"মনে নাই—তোদের আমার একটিং দেখানোর কথা?"

আমি সোজা হয়ে বসে বললাম, "সেটা এখন দেখাবি?"

রতন মাথা নাড়ল। আমি ফিসফিস করে বললাম, "তোর মাথা খারাপ হয়েছে? সারা স্কুল, সব আপা সব স্যার, ডিসি আর তাদের সবার সমনে তুই একটিং করবি? কী একটিং করবি?"

"পাগল হয়ে যাওয়া..."

আমি এত অবাক হলাম যে সেটা বলার মতো নয়, রাগ হলাম আরো বেশি। দাঁত কিড়মিড় করে বললাম, "খবরদার এখন কোনো পাগলামী করবি না। চুপ করে বসে থাক..."

রতন বলল, "কেন চুপ করে বসে থাকব?"

আমি বললাম, "খবরদার..."

রতন বলল, "তুই খবরদার!"

আমাদের কথাবার্তা মনে হয় একটু জোরেই হয়ে যাচ্ছিল কারণ অনেকেই আমাদের দুইজনের দিকে ঘুরে তাকাল। আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না তার মাঝে রতন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, আমি তাকে ধরে বসিয়ে দিতে চাইলাম কিন্তু রতন ছিটকে বের হয়ে গেল। সবাই অবাক হয়ে রতনের দিকে তাকিয়ে আছে, রতন তার আগে মাথা ঘুরিয়ে চারিদিকে তাকাল তারপর বাংলা সিনেমার নায়কের মতো ভান করে বলল, "আমি পাগল হয়ে আছি। পা-গ-ল!"

আমি বিস্ফারিত চোখে রতনের দিকে তাকালাম, দেখলাম সে তার শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করেছে। সর্বনাশ! তাহলে কি এখন এত মানুষের সামনে এই বেকুবটা সত্যি সত্যি তার কাপড় খুলে ফেলবে? কী করছি চিন্তা না করেই আমি লাফ দিয়ে উঠে রতনকে ধরে ফেললাম, লাফ নিশ্চয়ই বেশ জোরেই দিয়েছিলাম

কারণ আমার ধাক্কা খেয়ে রতন হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আমিও পড়লাম তার ওপর। হলঘরে বিশাল একটা হৈচৈ শুরু হয়ে গেল, স্যারেরা দৌড়ে এলেন, সাংবাদিককেরা ছুটে এলো সবার আগে। ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে তারা আমাদের কয়েকটা ছবি তুলে ফেলল। রতন চিৎকার করে কী বলছিল হৈচৈয়ের কারণে সেটা শোনা গেল না।

একজন স্যার আমার কলার ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে? কী হয়েছে?"

কে একজন বলল, "রতন পাগল হয়ে গেছে স্যার!"

"পাগল হয়ে গেছে?"

আমি রতনকে মাটিতে চেপে ধরে রেখে বললাম, "জি স্যার পাগল হয়ে গেছে।"

"ছেড়ে দাও একে। উঠো।"

আমি বললাম, "না স্যার। ছাড়া যাবে না।"

"কেন?"

"কী না কী করে ফেলবে স্যার।" আমি রতনকে শুধু নিচে চেপে ধরে রাখলাম, পেটে একটা হালকা ঘুষি মেরে ফিসফিস করে বললাম, "শুয়ে থাক। নড়লে খুন করে ফেলব।"

ততক্ষণে হেডস্যার, আপা এমনকী জেলা প্রশাসকও চলে এসেছেন। আমাদের গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়েছে সবাই। হেডস্যার চোখ কপালে তুলে বললেন, "কী হয়েছে এখানে?"

আমি রতনকে চেপে ধরে রেখে বললাম, "স্যার অঙ্ক মুখস্ত করতে করতে ব্রেন আউলে গেছে।"

"ব্রেন কী হয়ে গেছে?"

"আউলে গেছে স্যার।" স্যারদের মাঝে একটা গুঞ্জন শুরু হলো অঙ্ক আর মুখস্ত শব্দটা আমি কয়েবার শুনতে পেলাম। ডিসি এগিয়ে এসে বললেন, "অঙ্ক মুখস্ত করবে কেন? অঙ্ক কী কেউ মুখস্ত করে?"

এরকম একটা সুযোগ মনে হয় একশ বছরে একবার আসে, সেই সুযোগটা কোনোভাবেই ছাড়া যাবে না, আমি বললাম, "না স্যার, প্রাইভেট পড়লে মুখস্ত করতে হয় না। কিন্তু স্যার প্রাইভেট পড়তে টাকা লাগে সবার টাকা নাই স্যার।"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।" জেলা প্রশাসক অবাক হয়ে বললেন, "অঙ্ক

কেন মুখস্ত করবে? অঙ্ক মুখস্ত করতে গিয়ে ছেলে মেয়েদের নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়ে যাচ্ছে?"

তিনজন সাংবাদিক ছোট নোট বই বের করে আমার কাছে এগিয়ে এলো, জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? কে মুখস্ত করাচ্ছে? কেন করাচ্ছে? কে প্রাইভেট পড়ায়—"

আমি কিছু বলার আগেই হেড স্যার বললেন "এই ছেলেটাকে আগে বাইরে নিয়ে যাও, ডাক্তার ডাকতে হবে—"

আমি বললাম, " ডাক্তার লাগবে না স্যার। মাথায় একটু ঠাণ্ডা পানি দিয়ে বাতাস করলে ঠিক হয়ে যাবে।"

"তুমি জান?"

"জি স্যার, আগেও হয়েছে। আমরা ঠিক করে ফেলেছি।" আমি গলা উঁচিয়ে ডাকলাম, "সুমন, সাদিব। আয় রতনকে ধরে নিয়ে যাই।"

রতন ছটফট করছিল, আমরা তাকে ধরে জোর করে টেনে হিঁচড়ে বাইতে নিয়ে গেলাম, মজা দেখার জন্যে ছাত্রছাত্রীদের একটা বিশাল বাহিনী পিছনে পিছনে রওনা দিচ্ছিল কিন্তু হেড স্যারের একটা রাম ধমক খেয়ে সবাই হলঘরে ফিরে গেল। সুমন রতনের পেটের চামড়া ধরে ফিসফিস করে বলল, "একটা উল্টাপাল্টা কথা বলবি তো তুই ফিনিস। আমরা কথা বলব, তুই খালি মাথা নাড়বি।" রতন দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল।

আমরা আগে কোনোদিন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলি নাই কিন্তু তার পরেও কোনো সমস্যা হলো না। সাংবাদিকরা নানারকম প্রশ্ন করল, আমরা খুব গুছিয়ে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলাম। পরদিন খবরের কাগজে রতন আর রাক্ষস স্যারের ছবিসহ বিরাট একটা খবর বের হলো। খবরের হেডলাইন : "শিক্ষকের প্রাইভেট ব্যাবসার বলি কোমলমতি ছাত্র।" তার নিচে লেখা :

> "স্থানীয় বি কে স্কুলের গণিত শিক্ষক জনাব আক্কাস আলী তার প্রাইভেট পড়ানোর একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। ছাত্রছাত্রীদেরকে জোর করে প্রাইভেট পড়ানোর জন্যে তিনি ক্লাসে ছাত্র ছাত্রীদের অঙ্ক না পড়িয়ে জোর করে তাদের অঙ্ক মুখস্ত করতে বাধ্য করেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্কুলের একাধিক শিক্ষক বলেছেন এর চাপে বেশ কিছুদিন থেকেই ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে এক ধরনের অস্বাভাবিক ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। গতকাল স্কুল লাইব্রেরি উদ্বোধন করার সময় মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ওরফে রতন নামে জনৈক ছাত্র মানসিকভাবে পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে

www.MurchOna.com

ছোটাছুটি শুরু করলে তার সহপাঠিরা অনেক কষ্ট করে তাকে ধরে শান্ত করে। রতন বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছে, তার অবস্থা উন্নতির দিকে।

স্কুলের হেড মাস্টারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান যে তিনি এই ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত। তিনি স্কুলে পড়াশোনার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বদ্ধ পরিকর।

জেলা প্রশাসকের সাথে যোগযোগ করা হলে তিনি ছাত্রছাত্রীদের আশ্বস্ত করে বলেন যে শিক্ষাকে পণ্য করার বিষয়টি যেন না ঘটে তিনি সেটি নিশ্চিত করবেন।"

তার পরের ঘটনা খুব তাড়াতাড়ি ঘটে গেল। খবরের কাগজের রিপোর্ট ছাপা হবার পর এক রাতে রাক্ষস স্যারের প্রাইভেট ব্যবসা শেষ! স্যারকে আমাদের ক্লাশ থেকে সরিয়ে মজিদ স্যারকে অঙ্ক করার দায়িত্ব দেওয়া হলো। মাস খানেকের মাঝে রাক্ষস স্যার বদলী হয়ে গেলেন। যখন স্যারেরা বদলী হয়ে যান তখন একটা বিদায় অনুষ্ঠান হয় সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা বক্তৃতা দেয়—চাঁদা তুলে স্যারকে একটা ছাতা কিংবা একটা পাঞ্জাবি কিনে দেওয়া হয়। রাক্ষস স্যারের বেলাতে কিছুই হলো না, স্যার হঠাৎ একদিন বিদায় হয়ে গেলেন।

পুরো ঘটনায় সবচেয়ে বেশি লাভ হলো রতনের, তার বাসায় তাকে আর কেউ পড়াশোনা করতে বলার সাহস পায় না। পড়াশোনার চাপে মাথা খারাপ হয়ে গেছে সেটা তো আর সোজা কথা নয়, কেউ সেটা অবিশ্বাস করতে পারে না, রীতিমতো খবরের কাগজে সেটা বের হয়েছে, ছবিসহ!

www.MurchOna.com

৫.

আপুর কলেজ ছুটি হয়েছে তাই হোস্টেল থেকে বাসায় এসেছে। সে এমনিতেই একটু আঁতেল টাইপের। ঢাকা গিয়ে মনে হয় আরো বেশি আঁতেল হয়েছে। মোটা মোটা বই নিয়ে এসেছে, ডিটেকটিভ উপন্যাস আর সায়েন্স ফিকশান হলে একটা কথা ছিল সব বইগুলি জ্ঞানের বই। এখনই এই অবস্থা যখন আরো বড় হবে তখন কী অবস্থা হবে কে জানে! আপুর সাথে বিয়ে হবে যে ছেলেটির তার কী অবস্থা হবে আমি মাঝে মাঝে সেটা চিন্তা করি!

আপু আমাদের সাথে ঢাকার গল্প করে—পাঠচক্রে বড় বড় লেখকদের সাথে কীভাবে আড্ডা মারে, নাটকের রিহার্সেল কী হয়, সেমিনারে কীভাবে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করে এইসব গল্প। প্রত্যেকবার আমাদের গল্প শুনতে হয় এইবার উল্টোটা হলো, আমরা আপুকে রিয়াজ মামার গল্প শুনিয়ে দিলাম, আমি যে সাঁতার শিখে গেছি একেবারে পানির পোকার মতো সাঁতার কাটতে পারি সেটা শুনে আপু আসলেই অবাক হয়ে গেল, আমার মনে হলো তার হিংসে হলো আরো বেশি!

আপু যে শুধু একটু আঁতেল হয়েছে তা না, আমার মনে হলো হঠাৎ করে সে চেহারার দিকেও নজর দিচ্ছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নানাভাবে নিজেকে দেখে, তার প্রিয় চশমাটা মাঝে মাঝে খুলে চুলগুলো সামনে এনে নিজের চেহারাটা খুটিয়ে খুটিয়ে পরীক্ষা করে। চামড়া নরম করার জন্যে রাত্রে ঘুমানোর সময় মুখে কী এটা ক্রিম ঘষে, ক্রিমের গন্ধটা পাকা আমের মতন!

একদিন স্কুল থেকে এসে খেলতে যাবার জন্যে বইগুলো রেখে বের হতে যাচ্ছি আম্মু আমাকে থামালেন, বললেন, "এমনি যাবি না। কিছু খেয়ে যা।"

খেতে আমার আপত্তি নাই, চীপস, চটপটি, ঝালমুড়ি এরকম কত মজার মজার খাবার আছে কিন্তু আম্মু খেতে বলেন দুধ রুটি এইরকম বিস্বাদ খাবার! আমি বললাম, "খিদে পায় নাই আম্মু।"

www.MurchOna.com

আম্মু বললেন, "না পেলেও খেতে হবে। তোদের বাড়ন্ত শরীর ঠিক মতো না খেলে শরীর তৈরি হবে না। দুই স্লাইস রটি জেলি দিয়ে খেয়ে যা।"

"দুই স্লাইস পারব না আম্মু। আধ স্লাইস।"

"উহুঁ, দুই স্লাইস।"

"ঠিক আছে এক স্লাইস।" আম্মু দিলে দেরি হবে, তাই আমি নিজেই এক স্লাইস রুটি বের করে তার উপরে লাগানোর জন্যে জেলি খুঁজতে লাগলাম। ফ্রিজের ভেতরে একটা ছোট কৌটা জেলি পাওয়া গেল। রুটির উপর জেলি লাগিয়ে খেতে খেতে আমি বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম। দৌড়াতে দৌড়াতে যাচ্ছি তাই জেলি লাগনো রুটিটা যে খেতে একেবারেই জঘন্য সেটা বুঝতে বেশ অনেকটা সময় লেগে গেল। জেলিটাতে মিষ্টি কম, কে জানে আজকাল স্বাস্থ্যকর জেলি হয়তো একরমই হয়। খেতে একেবারেই ভালো লাগছিল না তারপরেও জোর করে খেয়ে ফেললাম।

রাত্রে ঘুমানোর আগে হঠাৎ আপু চিৎকার করে বলল, "আমার ক্রিম কে নিয়েছে?"

আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, "কীসের ক্রিম?"

আমার মুখের ক্রিম। "ঢাকার বাণিজ্য মেলা থেকে কিনে এনেছি। ফ্রিজে রাখা ছিল—"

আমি হঠাৎ করে চমকে উঠলাম, বিকেলে জেলি মনে করে আমি আপুর ক্রিমটা খেয়ে ফেলি নি তো? আপুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ক্রিম ফ্রিজে রেখেছ কেন?"

"এটা অনেক দামী ক্রিম, "বিদেশী। গরমে নষ্ট হয়ে যায়—"

"তাই বলে ফ্রিজে রাখবে? ফ্রিজে মানুষ রাখে খাবার জিনিস।"

"তাতে তোর সমস্যাটা কী?" আপু রেগে বলল, "আমার এত দামী ক্রিমের কৌটা দেখি খালি—কে মেখেছে এটা?"

আমি কিছু বললাম না, আমার সন্দেহ সত্যি দুপুরে জেলি মনে করে রুটির উপর লাগিয়ে আমি এটা খেয়ে ফেলেছি!

"কে মেখেছে?"

আম্মু বললেন, "কে মাখবে তোর ক্রিম?"

"এই দেখো আম্মু পুরোটা খালি—"

আমি বললাম, "কেউ মাখে নাই।"

"তাহলে গেল কোথায়?"

www.MurchOna.com

"আমি জেলি মনে করে রুটির উপর লাগিয়ে খেয়ে ফেলেছি!"

আপু নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না, বলল, "কী করেছিস?"

বললাম তো, "খেয়ে ফেলেছি। আমের মতো গন্ধ, মনে করেছিলাম ম্যাংগো জেলি!"

"খেয়ে ফেলেছিস?"

"হ্যাঁ।"

আপু তখনো নিজের কানকে বিশ্বাস করল না, জিজ্ঞেস করল, "খেয়ে ফেলেছিস?"

"হ্যাঁ।"

"আমার এত দামী ক্রিমটা তুই খেয়ে ফেলেছিস?"

"ইচ্ছে করে খেয়েছি নাকি? ফ্রিজের মাঝে রেখেছ আমি ভেবেছি জেলি! কী বাজে খেতে—ছিঃ!"

গভীর রাতে বাসায় সেই রাতে যা হইচই শুরু হলো তা আর বলার না। রাজু হি হি করে হাসছে, আপু রেগেমেগে চিৎকার করছে, আম্মু আর আব্বু আমাকে টেপাটেপি করে দেখছেন আর একবার আমাকে আরেকবার আপুকে বকাবকি করছেন! আমার কী হয় সেটা নিয়ে সবাই খুব দুশ্চিন্তার মাঝে ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হলো না। একেবারে কিছুই হলো না সেটা অবশ্যি সত্যি না, তবে যেটা হলো সেটা একেবারেই গোপনীয়—কাউকে তা বলা যাবে না। যদি বলি সবাই এত হাসাহাসি শুরু করবে যে সেটা আর বলার মতো নয়।

কয়দিন পর খাবার টেবিলে আব্বু বললেন, "তোরা কি জীন দেখতে চাস?"

"জীন?" আমরা সবাই অবাক হয়ে আব্বুর দিকে তাকালাম।

"হ্যাঁ জীন।"

রাজু জানতে চাইল, "সত্যিকারের জীন?"

"হ্যাঁ, সত্যিকারের জীন।"

"দেখব আব্বু দেখব।" আমি আর রাজু চিৎকার করতে লাগলাম। আপু তার চশমাটা নাকের কাছে ঠেলে দিয়ে বলল, "আব্বু জীন ভূত পরী এসব কিছু নেই। যদি থাকত তাহলে সায়েন্টিস্টরা এতদিনে তাদেরকে টেস্টটিউবে ভরে ইলেকট্রনিক ডিসচার্জ করে তাদের স্পেক্ট্রাম বের করে ফেলত!"

আমি বললাম, "আপু তুমি দেখতে না চাইলে দেখো না! আমরা দেখব!"

আপু বলল, "পৃথিবীর মানুষ যখন জিনোম প্রজেক্ট করছে তখন তোরা

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

করছিস জীন প্রজেক্ট!"

কথাটা বলে আপু খুব একটা ভাব করল—যেন গভীর একটা জ্ঞানের কথা বলেছে। জ্ঞানটা এতই গভীর যে আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না।

আম্মু আব্বুকে বললেন, "হঠাৎ করে তুমি জীন দেখানোর কন্ট্রাক্ট কোথায় পেলে?"

আব্বু হাসলেন, বললেন, "আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল ভূত প্রেত দত্যি দানব সবকিছু বিশ্বাস করেন! চক্রে বসেন, প্ল্যানচেট করেন। আত্মা আনেন, প্রেত সাধনা করেন।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। ভদ্রলোক খবর পেয়েছেন একজন মানুষ জীন আনতে পারে, তাকে ডেকে আনা হচ্ছে। ভাইস প্রিন্সিপালের বাসায় কাল রাতে সে জীন আনবে। আমাকে জীন দেখার দাওয়াত দিয়েছেন।"

"আমি যাব আব্বু, আমি যাব।" রাজু ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগল—আমি বললাম, "আমিও যাব দেখতে!"

আপু বলল, "আমি এসব বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমিও দেখতে যাব!"

আম্মু বললেন, "আমি জীবন্ত মানুষের অত্যাচারেই বাঁচি না, এখন জীন ভূত আর দেখতে চাই না! তোমরাই যাও!"

কাজেই পরদিন রাতে আব্বু আমাকে আর আপুকে নিয়ে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপারেল বাসায় রওনা হলেন। রাজু যদিও যাবার জন্যে খুব ব্যস্ত ছিল কিন্তু রাত পর্যন্ত সে জেগে থাকতে পারল না। জীন দেখার উত্তেজনায় সে আগেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ভাইস প্রিন্সিপালের বাসা আমাদের বাসা থেকে বেশ খানিকটা দূরে, এলাকাটা বেশ নির্জন, অন্ধকারে হেঁটে যেতে যেতে আমার গা ছম ছম করতে শুরু করল!

ভাইস প্রিন্সিপালের বাসায় গিয়ে দেখি জীন দেখার জন্যে আরো অনেকে এসেছে। বেশির ভাগই বয়স্ক মানুষ জন, আমাদের মতো স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়ে খুব কম। সবাই বড় ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করছে। ঘরের এক কোনায় মেঝেতে ছোট একটা চাদর বিছিয়ে একজন মানুষ বসে আছে। মাথায় টুপি, পরনে সবুজ রঙের পাঞ্জাবি। শক্ত সমর্থ চেহারা, গায়ের রঙ কালো, মুখে কাচা পাকা দাড়ি। আমরা যখন পৌঁছেছি তখন এই মানুষটা বিড় বিড় করে দোয়া দরুদ পড়ছে।

ভাইস প্রিন্সিপাল সাহেব আমাদের দেখে বললেন, "তোমরা ভয় পাবে না তো?"

ভয়ে আমার পেটের ভাত চাউল হয়ে যাচ্ছিল তবুও আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "না ভয় পাব না।"

মেঝেতে বসে থাকা কালো রঙের মানুষটা আমাদের দিকে তাকাল, চোখের দৃষ্টি ভয়ানক, দেখে বুকটা ধ্বক করে ওঠে। ভাইস প্রিন্সিপাল বললেন, "ইদরিস, তুমি তাহলে শুরু করে দাও।"

ইদরিস নামের কালো রঙের মানুষটা বলল, "স্যার, আপনি যদি বলেন তাহলে আমি শুরু করি, কিন্তু স্যার কাজটা কিন্তুক খুব বিপদের।"

ভাইস প্রিন্সিপাল বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ সেটা আমরা জানি।"

"কেউ যেন কোনো কথা না বলে, নিজের জায়গা থেকে যেন না নড়ে।"

"নড়বে না, কেউ নড়বে না।"

"জীনকে বশ করা খুব কঠিন কাজ, তারা বশ হতে চায় না, জোর করে বশ করতে হয়। সেইজন্যে খুব গোস্বা করে থাকে। অনেকবার আমার ক্ষতি করতে চেষ্টা করেছে কিন্তুক পারে নাই।"

একজন জিজ্ঞেস করল, "কেন পারে নাই?"

"আমার কাছে একটা তাবিজ আছে। সেই তাবিজের জন্যে পারে নাই। এই তাবিজ খুব সাবধানে রাখতে হয়, জীন খালি ছিঁড়ে নিতে চায়।"

ভাইস প্রিন্সিপাল জিজ্ঞেস করলেন, "কীভাবে সাবধানে রাখেন?"

"শরীল কেটে মাংশের ভিতরে ঢুকায়ে দিছি। দশ বছর থেকে শরীলের ভিতর আমার তাবিজ আছে তাই আমার কুনো ক্ষতি করতে পারে না।"

বিষয়টা চিন্তা করেই আমার শরীরটা কেমন জানি গুলিয়ে উঠল। ইদরিস নামের মানুষটা বলল, "যখন জীন আসবে তখন কেউ লড়াচড়া করবেন না। উল্টাপাল্টা কথা বলবেন না। ঘরের ভিতরে গোন্ধ হতে পারে—'

একজন জিজ্ঞেস করল, "কী রকম গন্ধ?"

"সেটা জীনের উপর নির্ভর করে। ভালো প্রকৃতির জীন হলে সুবাস—খারাপ প্রকৃতির জীন হলে দুর্গন্ধ বের হয়।"

ভাইস প্রিন্সিপাল বললেন, "তোমার খারাপ প্রকৃতির জীন আনার দরকার কী? ভালো প্রকতির জীন আন।"

ইদরিস বলল, "চেষ্টা করব। কখন কে আসে তার ঠিক নাই। তবে মনে রাখবেন কেউ যেন আলো না জালায়। ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার থাকতে হবে, আলো

www.MurchOna.com

থাকলে জীন আসবে না।"

"যখন আসবে তখন যদি আলো জ্বালাই তাহলে কী আমরা জীনকে দেখতে পারব?"

ইদরিস শিউরে উঠে বলল, "গত বছর আমি যশোরে জীন আনছিলাম তখন একজন লাইট জ্বালাইছিল। তারপর—" ইদরিস নামের কালো মানুষটা শিউরে উঠে থেমে গেল।

একজন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "তখন কী হয়েছিল?"

"দুইজন তো ভয়ে পুরা পাগল। এখন পাগলা গারদে আছে। বেন্ধে রাখতে হয়।"

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন? দেখতে কী রকম?"

"আমি কী সেই বর্ণনা দিতে পারব? মানুষের চামড়া ছিলাইলে যেইরকম দেখায় অনেকটা সেইরকম।"

শুনে আমার সারা শরীর শিউরে উঠল।

ভাইস প্রিন্সিপাল বললেন, "দেরি করে কাজ নেই, শুরু করে দাও।"

ইদরিস বলল, "তাহলে লাইট নিভান।"

ঘরের আলো নিভাতেই সারা ঘর কুচকুচে অন্ধকার হয়ে গেল, এমন অন্ধকার যে নিজের হাতকেও দেখা যায় না। মেঝেতে বসে থাকা ইদরিস বিড়বিড় করে কী যেন দোয়া দরুদ পড়ছে মাঝে মাঝে বিদঘুটে এক ধরনের শব্দ করছে। এত অন্ধকার যে খুব ভালো করে তাকিয়েও কিছু দেখা যায় না। আমি আপুর এক পাশে বসে আছি, অন্য পাশে আব্বু। ঘরে এমন একটি থমথমে আবহাওয়া যে দুজনের মাঝখানে বসেও ভয়ে আমি রীতিমতো কাঁপতে শুরু করেছি।

হঠাৎ ঘরের মাঝখানে ধড়াম করে খুব জোরে একটা শব্দ হলো। খালি চেয়ার টেবিলগুলো মটমট করে উঠল, নড়তে লাগল, শব্দ শুনে মনে হলো বিশাল কিছু একটা ঘরের ভেতরে হাজির হয়েছে। নিঃশ্বাসের এক ধরনের শব্দ হয়, মনে হতে থাকে অনেক জোরে জোরে কেউ নিঃশ্বাস নিচ্ছে। অন্ধকার ঘরে এই প্রাণীটি হাঁটছে এবং জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হলো আমি ভয়ে হার্টফেল করে মরেই যাব। একপাশে আব্বু অন্য পাশে আপু আছে বলে রক্ষা তা না হলে চিৎকার করে আমি নির্ঘাত অজ্ঞান হয়ে যেতাম। একজন মানুষের শরীরের চামড়া ছিলে নিলে তাকে দেখতে যেরকম দেখাবে এই প্রাণীটি দেখতে সেরকম চিন্তা করেই আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

মেঝেতে বাসে থাকা ইদরিস বলল, "কেউ ভয় পাবেন না। চুপ করে বসে

থেকে দরুদ শরিফ পড়েন।"

ঘরে যারা বসে আছে সবাই গুনগুন করে দরুদ শরিফ পড়তে শুরু করে। ইদরিস জিজ্ঞেস করল , "তুমি কী আসছ?"

গমগমে মোটা গলায় একজন উত্তর করল, "আসছি।"

"নাম কী তোমার?"

"ও-য়া-জি-উ-ল্লা-হ্।"

"ওয়াজিউল্লাহ, এইখানে স্যারেরা আছেন, তাদের বেটা-বেটিরা আছেন, তাদের পরিবাররা আছেন, সবাইরে দোয়া করো।"

ঘরে উপস্থিত জীন যার নাম ওয়াজিউল্লাহ সে বিড়বিড় করে দোয়া করে বিকট শব্দ করে একটা ফু দিল। আমরা সবাই সে ফু'টা টের পেলাম। জীনের মুখের বাতাসে এক ধরনের বোটকা গন্ধ—ভয়ে এবং আতংকে আমার হার্টফেল করার অবস্থা।

ওয়াজিউল্লাহ নামের জীনটা ঘরের মাঝে হেঁটে বেড়াতে লাগল। তার পায়ের শব্দে ঘর কাঁপতে থাকে, চেয়ার টেবিল নড়তে থাকে। ইদরিস তখন আমাদের উদ্দেশ্য করে বলল, "আপনারা কেউ ওয়াজিউল্লাহকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন?"

ভয়ে সবারই নিশ্চয়ই আমার মতন অবস্থা, কেউ কোনো কথা বলল না, শুধু ভাইস প্রিন্সিপাল সাহেব চিঁ চিঁ করে বললেন, "জনাব, আপনার কোনো তকলিফ হচ্ছে না তো?"

ওয়াজিউল্লাহ গমগমে গলায় বলল, "না। আমার কোনো তকলিফ হয় নাই। অনেক দূর থেকে আসছি—সময় কম।"

ভাইস প্রিন্সিপাল বললেন, "জনাব, আমার গরিবখানায় আসছেন। আপনার পেরেশানী হয়েছে, মনে কিছু নিবেন না।"

ওয়াজিউল্লাহ বলল, "নেই নাই। কী বলবি বল।"

"আমার পরিবার বাতের বেদনায় কষ্ট পায়। তার জন্যে একটা ওষুধ—"

"ওষুধ আমার হাতে নাই। ওষুধ আনতে সময় লাগে।"

মেঝেতে বসে থাকা ইদরিস বলল, "তুমি কালকে আনতে পারবা?"

"পারব।"

"ঠিক আছে কাল নিয়ে আসো। স্যারের পরিবারের কষ্ট।"

ওয়াজিউল্লাহ ফোঁস করে বিশাল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আনব। আমি আনব।"

ঘরের ভেতরে ওয়াজিউল্লাহ হেঁটে বেড়াতে থাকে, তার শরীরের ধাক্কায়

www.MurchOna.com

চেয়ার টেবিল নড়তে থাকে। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস নেয়—ভয়ে আতংকে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কিছুক্ষণ এভাবে থেকে হঠাৎ সে চেয়ার-টেবিল কাঁপিয়ে নীরব হয়ে গেল।

মেঝেতে বসে থাকা ইদরিস বলল, "ওয়াজিউল্লাহ্ তুমি কী চলে গেছ?"

কোনো উত্তর নেই। ইদরিস তখন চলল, "আলহামদুলিল্লাহ্! সব কিছু ঠিক মতন শেষ হয়েছে। জীন চলে গেছে। কেউ একজন লাইট জ্বালান।"

ঘরের লাইট জ্বালানো হলো, সবাই একজন আরেকজনের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাতে শুরু করে। সবার মুখই ফ্যাকাসে এবং রক্তশূন্য। মেঝেতে ছোট একটা চাদর বিছিয়ে ইদরিস হাঁটু মুড়ে বসে আছে। আমরা সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। ইদরিস বলল, "ওয়াজিউল্লাহ শান্ত কিসিমের জীন, বেশি ডিস্টার্ব দেয় না। একটা জীন আছে নাম সিরাসিন, ভয়ংকর জীন। আগেরবার এসে আমার উরুতে কামড়ে দিয়েছিল। এখনো দাগ আছে।"

আমি আর শুনতে চাচ্ছিলাম না। ভয়ে আমার হাত-পা শরীরের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছিল। আমি আব্বুর হাত ধরে বললাম, "আব্বু বাসায় চলো। আমার ভয় করছে।"

আপু মুখে কিছু বলল না কিন্তু দেখেই বুঝতে পারছিলাম যে সে আমার থেকেও বেশি ভয় পেয়েছে! আব্বু বললেন, "চল যাই।"

আমরা দুজন তখন আব্বুর দুই হাত ধরে কোনোরকমে বাসায় ফিরে এলাম। আম্মু আমাদের দুইজনের দিকে এক নজর দেখেই বললেন, "কী হয়েছে তোদের?"

আপু শুকনো গলায় বলল, "তুমি বিশ্বাস করবে না আম্মু, কী ভয়ংকর!"

আমি বললাম, "একটা জীন ঘরের ভেতরে লাফাচ্ছে..."

"তোরা দেখেছিস?"

আপু বলল, "বল কী আম্মু! ঘুটঘুটে অন্ধকার..."

আম্মু বললেন, "দূর বোকা, তোদের বোকা বানিয়েছে!"

আমি আর আপু একসাথে চিৎকার করে উঠলাম, "না! আম্মু, না! সত্যি সত্যি জীন। কথা শুনেছি। মোটা গলার স্বর—"

আম্মু তবু গুরুত্ব দিলেন না, হাত নেড়ে পুরোটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, "তোদের রিয়াজ মামা ফোন করেছিল! তোদের খোঁজ করছিল। আমি বললাম একজন ঘুমাচ্ছে অন্য জন জীন দেখতে গেছে। শুনে হাসতে হাসতে খুন হয়ে গেছে।"

www.MurchOna.com

আমি রাগ হয়ে বললাম, "মামা নিজে তো দেখে নাই তাই হাসতে হাসতে খুন হয়ে গেছে! নিজে দেখলে মজাটা টের পেতো।"

আব্বু জিজ্ঞেস করলেন, "কোত্থেকে ফোন করেছে?"

"আমেরিকা থেকে।"

"আমেরিকা থেকে ফোন করেছে? কেন?"

"এমনি। গল্প করত।"

"আচ্ছা পাগল দেখি!"

আম্মু হাসলেন, বললেন, "হ্যাঁ, আচ্ছা পাগল। বলেছে আবার ফোন করে জীন দেখা কেমন হলো তার খোঁজ নেবে।"

আম্মুর কথা শেষ হবার আগেই ফোন বেজে উঠল, আম্মু বললেন, "ঐ যে! নিশ্চয়ই রিয়াজ।"

আমি ছুটে গিয়ে ফোন ধরলাম, "হ্যালো।"

"কে লিটু নাকি? কী খবর?" মামার গলার স্বর এত স্পষ্ট যে মনে হচ্ছে একেবারে পাশের ঘর থেকে কথা বলছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন আছ মামা?"

"আমি ভালো আছি। তোর অবস্থা এত খারাপ হলো কেন?"

"আমার কী হয়েছে।"

"তুই নাকি জীন দেখতে যাস! কী করে তোর জীন?"

"তুমি বিশ্বাস করবে না মামা, ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার মাঝে ঘরের ভেতরে ধরাম করে একটা চেয়ার সরিয়ে..."

রিয়াজ মামা আমাকে থামালে, "কী বললি? চেয়ার সরিয়ে..."

"হ্যাঁ। চেয়ার-টেবিল ধাক্কা দিয়ে সরিয়েছে। গলার স্বর এই মোটা..."

"শোন।" রিয়াজ মামা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "কেউ যদি দেখাতে পারে বাইরের কোনো ফোর্স ছাড়াই একটা চেয়ার নিজে থেকে সরে যাচ্ছে, সে সাথে সাথে একটা নোবেল প্রাইজ পেয়ে যাবে! বুঝলি?"

"নোবেল প্রাইজ?"

"হ্যাঁ।" রিয়াজ মামা বললেন, "কেন জানিস?"

"কেন?"

"কেউ যদি কোনো ফোর্স না দিয়ে একটা চেয়ার সরিয়ে দিতে পারে সেটা ফিজিক্সের সব ল ভায়োলেট করে ফেলে। পৃথিবীর সব বৈজ্ঞানিকরা গত কয়েকশ বছর থেকে যেটা কোনোদিন করতে পারে নাই তোর জীনওয়ালা সেটা করে

ফেলেছে! তাকে আমেরিকা নিয়ে আয়, সে এক ডজন নোবেল প্রাইজ পেয়ে যাবে!"

আমি ইতস্তত করে বললাম, "তুমি বলছ এইটা ভুয়া?"

"শুধু ভুয়া না এটা হচ্ছে সুপার ভুয়া! যদি আর কোনোদিন দেখিস জীন এসে লাফ-ঝাপ দিচ্ছে লাইট জ্বালিয়ে দিস! তাহলে মজাটা টের পাবে!"

"লাইট জ্বালিয়ে দিব?"

রিয়াজ মামা বললেন, "অবশ্যই লাইট জ্বালিয়ে দিবি। যত সব জোচ্চুর, ধরে তাদের জেল দেয়া দরকার!"

"যদি দেখি আসলেই একটা জীন। শরীরে চামড়া নেই..."

রিয়াজ মামা আবার হা হা করে হাসলেন, বললেন তাহলে তোকে আর তোর জীনওয়ালাকে আমি আমেরিকা নিয়ে আসব! ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে দেখাব, একশ ডলার করে টিকেট। এক সপ্তাহে একশ মিলিওন ডলার কামাই করে ফেলব। অর্ধেক দিব তোর জীনওয়ালাকে বাকি অর্ধেক তোর আর আমার..."

আমি ইতস্তত করে বললাম, "তার মানে তুমি বলছ এইটা আসলে মিথ্যা?"

"একশবার! যদি আর কোনোদিন দেখিস ঠিক মাঝখানে লাইট জ্বালিয়ে দিবি। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে মামা।"

রিয়াজ মামা আরো কিছুক্ষণ গল্প করলেন তারপর ফোন রেখে দিলেন। ওয়াজিউল্লাহ জীনের লাফ-ঝাপ শুনে আমি যেরকম ভয়ে জবু থবু হয়ে ফিরে এসেছিলাম, রিয়াজ মামার কথা শুনে হঠাৎ করে ভয়টা কেটে গেছে! সত্যিই তো কথা নেই বার্তা নেই একটা জীন কোথা থেকে চলে আসবে? পুরোটাই এক ধরনের ধাপ্পাবাজী!

পরদিন স্কুলে আমি সবাইকে গতরাতের জীনের গল্পটা বললাম, সেই গল্পটা শুনে রিয়াজ মামা কী বলেছেন সেটাও বললাম। সুমন বলল, "তোর মামা ঠিকই বলেছেন! আসলেই এই ধাপ্পাবাজকে ধরিয়ে দেয়া দরকার।"

"কীভাবে ধরিয়ে দেবো?"

"চল আজ রাতে আমরা সবাই মিলে যাই। পকেটে করে টর্চ লাইট নিয়ে যাব, ঠিক যখন জীন আসবে তখন টর্চ লাইটটা জ্বালিয়ে দিব!"

আমি সুমনের দিকে তাকালাম, "সত্যি করবি?"

"কেন করব না?"

www.MurchOna.com

সাদিব বলল, "আইডিয়াটা খারাপ না! আয় সবাই মিলে যাই!"

রতন বলল, "টর্চ লাইটফাইট দিয়ে হবে না। লাফ দিয়ে জীনের ঘাড়ে উঠতে হবে তারপর ল্যাং মেরে ফেলে দিতে হবে—"

আমরা অবাক হয়ে রতনের দিকে তাকালাম, অন্ধকারে সে লাফিয়ে জীবনের ঘাড়ে উঠে বসেছে দৃশ্যটি এত অদ্ভুত যে আমাদের কল্পনা করতেই রীতিমতো সমস্যা হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুই তাহলে যাবি ভাইস প্রিন্সিপালের বাসায়, জীন দেখতে?"

রতন উদাস মুখে বলল, "দেখি!"

রাত্রি বেলা অবশ্যি সুমন সাদিব কেউই তাদের টর্চ লাইট নিয়ে জীন দেখতে এলো না। সত্যি সত্যি চলে আসবে সেটা অবশ্যি আমি আশাও করি নাই, একটা ছেলে যদি বলে, "আমি আজ রাতে এক বন্ধুর সাথে জীন দেখতে বের হবো" তার বাবা-মা তাকে ঘর থেকে বের হতে তো দেবেই না বরং আচ্ছা করে কান মলে দিতে পারে। তবে রতনের কথা আলাদা, সত্যিই যদি সে গভীর রাতে ভাইস প্রিন্সিপালের বাসায় হাজির হয় এবং সুযোগ বুঝে জীনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে আমি একটুও অবাক হবো না!

কাজেই যখন রাত বারোটার দিকে ভাইস প্রিন্সিপাল আব্বুকে ফোন করে এক্ষুনি তার বাসায় যেতে বললেন, খুব জরুরি ব্যাপার তখন আমি বুঝে গেলাম কী হয়েছে! নিশ্চয়ই রতন জীনের ঘাড়ে লাফ দিয়ে পড়ে তাকে ধরে ফেলেছে! আব্বু যখন শার্টপ্যান্ট পরে রওনা দিলেন আমিও তার সাথে রওনা দিলাম।

এত রাতে ভাইস প্রিন্সিপালের বাসায় লোকজন গিজ গিজ করছে। বারান্দায় একটা থাম্বার সাথে ইদরিস নামের জীন আনার মানুষটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। কাছাকাছি একটা চেয়ারে রতন বসে আছে তাকে ঘিরেও একটা ছোটখাটো ভীড়। আব্বুকে দেখে ভাইস প্রিন্সিপাল তাড়াতাড়ি হেঁটে এলেন, বললেন, "দেখেন স্যার, জীনওয়ালা ইদরিস কত বড় ঠগ কত বড় জোচ্চোর। কত বড় বদমাইস—"

আব্বু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

ভাইস প্রিন্সিপাল রতনকে দেখিয়ে বললেন, "এই ছেলেটা যদি এই ঠগ জোচ্চোর বদমাইসটাকে না ধরত তাহলে তো আমাদের বোকা বানিয়ে চলেই যেত!"

আব্বু অবাক হয়ে বললেন, "কীভাবে ধরেছে?"

"যখন এই বদমাইসটা জীন সেজে ভড়ংচড়ং করছে তখন সে লাফ দিয়ে

www.MurchOna.com

ঘাড়ে উঠে পড়েছে! তারপর চিৎকার!"

আব্বু অবাক হয়ে রতনকে বললেন, "তোমার দেখি সাংঘাতিক সাহস! ভয় করল না?"

রতন মাথা নাড়ল, বলল, "নাহ্! ভয় করে নাই। আমি জানি এইটা ভূয়া জীন!"

"কেমন করে জান?"

রতন আমাকে দেখাল, "লিটু বলেছে!"

আব্বু এবারে আমার দিকে তাকালেন, "তুই বলেছিস! কাল তো দেখি ভয়ে আধমরা হয়ে ছিলি!"

আমি বললাম, "রিয়াজ মামা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বিজ্ঞান মতে অসম্ভব।"

ভাইস প্রিন্সিপাল বললেন, "কী লজ্জা! এই ছোট ছোট ছেলেগুলোর যত বুদ্ধি আমাদের মতো বুড়ো মানুষের সেটা নাই।"

আব্বু মাথা নাড়লেন, বললেন, "ঠিকই বলেছেন। সেটাই সমস্যা!"

আব্বু আর ভাইস প্রিন্সিপাল থাম্বায় বেঁধে রাখা ইদরিসের কাছে গেলেন, মানুষটা মাথা নিচু করে আছে। আব্বু বললেন, "নাম কী তোমার? বাড়ি কোথায়?"

মানুষটা হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, "মাফ করেদেন হুজুর! গরিব মানুষ—একটা ভুল করে ফেলেছি—"

"একটা কী বলছ! অনেকদিন থেকেই তো করছ! আমি পর্যন্ত বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। লোক ঠকিয়ে খাও লজ্জা করে না?"

মানুষটা বলল, "মাফ করে দেন হুজুর। আর করব না—"

ভাইস প্রিন্সিপাল বললেন, "পুলিশে খবর দিয়েছি স্যার। আসছে।"

বড়রা কথা বলতে লাগল, আমি তখন রতনের কাছে গেলাম, সে মুখে গভীর একটা ভাব নিয়ে বসে আছে। আশেপাশে যারা আছে তারা অবাক হয়ে রতনকে দেখছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছিল রতন, বল দেখি?"

"কী আর হবে! তুই তো বলেই দিয়েছিস ভূয়া জীন, তাই আমার একটুও ভয় করে নাই! যখনই ঐ ব্যাটা জীনওয়ালা আমার সামনে এসেছে আমি লাফ দিয়ে ঘাড় ধরে ঝুলে পড়ে চিৎকার শুরু করেছি ভূয়া ভূয়া ভূয়া—"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, সবাই তখন দৌড়াদৌড়ি করে লাইট জ্বালিয়েছে, দেখে আমি লোকটার

www.MurchOna.com

ঘাড় ধরে ঝুলে আছি! লোকটা কী অবাক হয়েছে তুই চিন্তা করতে পারবি না!"

"তারপর কী হলো?"

"দৌড় দিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল, আমি ঘাড় ধরে ঝুলেছিলাম বলে পালাতে পারে নি!" রতন হি হি করে হাসতে লাগল!

রাতে বাসায় আসার পর শুনি টেলিফোন বাজছে, এত রাতে রিয়াজ মামা ছাড়া আর কে ফোন করবে? আমি দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরলাম, "হ্যালো? কে রিয়াজ মামা?"

"হ্যাঁ! তোদের জীনের কী খবর?"

"ভূয়া জীন মামা! তুমি ঠিকই বলেছ!" আমি রিয়াজ মামাকে পুরো গল্পটা খুলে বললাম, শুনে হাসতে হাসতে মামার প্রায় হার্টফেল করার অবস্থা। বললেন, "পরেরবার যখন আসব তখন তোর এই রতনকে একটা গোল্ড মেডেল দিব! বিজ্ঞানের ওপর বিশ্বাসের জন্যে গোল্ড মেডেল!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "পরেরবার কখন আসবে মামা?"

"এই তো সামারের ছুটিতে! নূতন জায়গায় এসেছি তো হঠাৎ করে ছুটি পাওয়া কঠিন।"

"তোমার নূতন জায়গা কেমন মামা?"

"জায়গাটা ভালোই, তবে মানুষগুলো একটু গাধা টাইপের। কালকে এক পাকিস্তানির সাথে পরিচয় হলো, আমাকে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কোথা থেকে এসেছ?" আমি বললাম, "বাংলাদেশ!" লোকটা বলে, "ও ইস্ট পাকিস্তান!" আমি বললাম, "না! বাংলাদেশ। ইস্ট পাকিস্তান বহুত আগেই শেষ।" লোকটা বলে, "বাংলাদেশ ইস্ট পাকিস্তান একই কথা!" আমার খুব মেজাজ খারাপ হলো কিন্তু কিছু বললাম না, জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার নাম কী?" লোকটা বলল, "রিজওয়ান খান!" আমি তার সাথে টুকটাক কথা বলে চলে যাবার সময় বললাম, "ঠিক আছে খলীলুল্লাহ, আমি তাহলে যাই?" পাকিস্তানি লোকটা বলল, "আমার নাম খলীলুল্লাহ না, আমার নাম রিজওয়ান খান!" আমি বললাম, "ঐ একই কথা! লোকটার চেহারা তখন যদি দেখতিস—" রিয়াজ মামা হা হা করে হাসতে লাগলেন।

একাত্তর সালে পাকিস্তানিরা নিশ্চয়ই এই দেশের উপর খুব অত্যাচার করেছে তা না হলে যারা বড় মানুষ তারা কেউ পাকিস্তানিদের একেবারে সহ্য করতে পারে না কেন?

www.MurchOna.com

৬.

মে মাসের শেষ থেকেই বৃষ্টি শুরু হলো। এই এলাকাটাতে নিশ্চয়ই খুব বৃষ্টি পড়ে—আকাশ কালো করে দিনের পর দিন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়তে থাকে। অনেক মানুষ আছে যারা বৃষ্টি সহ্য করতে পারে না—আমার কিন্তু বৃষ্টি অসম্ভব ভালো লাগে। বৃষ্টির দিনে একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে জানালার কাছে বসে বাইরের বৃষ্টি দেখতে দেখতে একটা ভূতের গল্প বই নিয়ে বসতে আমার যা ভালো লাগে সেটা আর বলার নয়। আমাদের বাসার চারপাশে বড় বড় গাছ, গাছের নিচে পানি জমে থাকে সেখানে ব্যাঙদের বিরাট সমাবেশ, সবাই মিলে ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ করে ডাকতে থাকে—সেটাও ভারি একটা মজার জিনিস। যারা দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যায়— সেখানে বৃষ্টি নেই ব্যাঙের ডাক নেই তারা সেখানে কেমন করে থাকে কে জানে।

আমরা এখানে নূতন এসেছি তাই ঠিক জানি না, অন্যেরা বলতে লাগল এই বছর বৃষ্টি বেশি হচ্ছে। বেশি বৃষ্টি হলে আমার কোন আপত্তি নেই, যত বৃষ্টি তত মজা, দেখতে দেখতে বাসার পাশে নিচু জায়গাগুলো পানিতে ভরে যেতে লাগল। বাসার জানালায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি, এগুলোকেই নাকি বলে হাওর। মাঝে মাঝে হাওরের পানির ওপর দিয়ে বৃষ্টির ঝাপটা বয়ে যেতে থাকে সেই দৃশ্য দেখে আমি একেবারে হতবাক হয়ে বসে থাকি।

কয়েকদিনের ভেতরেই খবর পেলাম এবারে এত বৃষ্টি হচ্ছে যে চারপাশে নাকি বন্যা শুরু হয়ে যাচ্ছে। আমি নিজের চোখে আগে কখনো বন্যা দেখি নি, খবরের কাগজে ছবি দেখেছি মানুষজন মাথায় পোটলাপুটলি নিয়ে বাচ্চাকাচ্চার হাত ধরে বন্যার পানি ভেঙে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। এবারে সত্যি সত্যি সেগুলো দেখতে পেলাম, শহরের নিচু এলাকায় পানি এসেছে, মানুষজন সেই পানি ভেঙে

www.MurchOna.com

হেঁটে এসে রাস্তা ঘাটে আশ্রয় নিতে শুরু করেছে। বড় বড় প্লাস্টিক টানিয়ে তার নিচে মানুষজন বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বসে থাকে। হঠাৎ করে আমি টের পেলাম ঘরের ভেতরে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখতে ভারি মজা, কিন্তু রাস্তার পাশে একটা প্লাস্টিকের নিচে ভেজা মাটিতে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে গুটিশুটি মেরে বসে থাকা মোটেও মজার কিছু নয়, সেটা খুব কষ্ট।

আমরা ছাতা মাথায় দিয়ে স্কুলে যাই, স্কুল থেকে ফিরে আসি, রাস্তার পাশে এতগুলো মানুষ এত কষ্ট করছে দেখে খুব খারাপ লাগে কিছু করতেও পারি না। তখন একদিন তানিয়া খবর আনল, তার পরিচিত একটা সংগঠন বন্যার জন্যে রিলিফ কাজ করছে, আমরা ইচ্ছে করলে সেখানে গিয়ে সাহায্য করতে পারি।

স্কুল ছুটির পর আমরা দলবেধে তানিয়ার সাথে গেলাম। ডিগ্রি কলেজের একটা হলঘরে অনেক মানুষ কাজ করছে। কেউ কেউ রুটি তৈরি করছে কেউ রুট সেঁকছে, কেউ রুটি প্যাকেটে ভরছে কেউ খাবার স্যালাইন তৈরি করছে সব মিলিয়ে রীতিমতো একটা হৈচৈ ব্যাপার। তানিয়া একজন কলেজের ছেলের কাছে গিয়ে বলল, "জাহাঙ্গীর ভাই, আপনি বলেছিলেন আপনার ছেলে-মেয়ে দরকার, আমি আমাদের ক্লাশের ছেলে মেয়েদের নিয়ে এসেছি।"

জাহাঙ্গীর ভাই নামের মানুষটা খুব খুশি হয়ে উঠলেন, বললেন, "ভেরি গুড! আমাদের আজকে অনেক মানুষ দরকার, তোমরা কাজে লেগে যাও।"

"কোন কাজে লাগব জাহাঙ্গীর ভাই?"

"খাবার স্যালাইনে চলে যাও। প্যাকেটে ভরার কাজে লোক শর্ট পড়েছে।"

তানিয়া আমাদেরকে নিয়ে গেল খাবার স্যালাইনের জায়গায়। সেখানে অনেকে ডাক্তারদের মতো মুখে মাস্ক আর সাদা ওভার অল পরে কাজ করছে। একজন তানিয়াকে দেখে খুশি হয়ে বলল, "আরে! তানিয়া চলে এসেছে, আর আমাদের চিন্তা নাই।"

অন্য অনেকে আনন্দের মতো একটা শব্দ করল। রতন যে তানিয়াকে মাদার টেনিয়া ডাকে তার পিছনে সত্যিই একটা কারণ আছে! তানিয়া বলল, "আমি একা আসি নাই সঞ্জয় ভাই। আমাদের ক্লাশের অনেক ছেলে-মেয়ে নিয়ে এসেছি।"

"ভেরি গুড। কাজে লেগে যাও। তুমি তো জান কী করতে হবে?"

"জানি সঞ্জয় ভাই।"

তানিয়া প্রথমে আমাদের সবাইকে নিয়ে সাবান দিয়ে খুব ভালো করে হাত-মুখ ধুইয়ে আনল। তারপর আমাদের সবার মুখে একটা মাস্ক পরিয়ে দিল, হাতে প্লাস্টিকের গ্লাভস। ছোট ছোট প্লাস্টিকের প্যাকেট রাখা ছিল আমরা তার ভেতরে

www.MurchOna.com

খাবার স্যালাইন ভরতে লাগলাম। ফিল্মের কৌটা কেটে একটা মাপ ঠিক করা হয়েছে, সেই কৌটায় এক কৌটা করে স্যালাইন প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরছে। সিল করার এক ধরনের যন্ত্র আছে, প্যাকেটটা রেখে চাপ দিলেই সিল হয়ে যায়।

সবাই মিলে কাজে লেগে গেলাম। প্রথম মিনিট দশেক মনে হয় কাজটা খুবই সোজা, সারা জীবনই এই কাজকরা সম্ভব। এর পর মনে হতে থাকে কাজটা সোজা হতে পারে কিন্তু কাজটা খুব একঘেঁয়ে—এই কাজ একটানা বেশিক্ষণ করা মোটেও মজার কিছু না! তখন থেমে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু না থেমে একরকম জোর করে কাজ করে যেতে হয়। এভাবে ঘণ্টাখানেক যাবার পর হঠাৎ করে কাজটা মেশিনের মতো হতে থাকে তখন আমরা যে কোনো কাজ করছি সেটা মনেই থাকে না।

অন্ধকার না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা কাজ করে গেলাম। আমাদের কাজ দেখে জাহাঙ্গীর ভাই মহা খুশি! বললেন, "এই দেখো তোমরা কতগুলো প্যাকেট করে ফেলেছ, আমরা সারা দিনে যা পারি নি তোমরা এক সিটিংয়ে সেটা করে ফেলেছ।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এই স্যালাইনগুলো কয়জনকে দেয়া যাবে?"

জাহাঙ্গীর ভাই মনে মনে হিসেব করে বললেন, "সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন হলে চার পাঁচটা স্যালাইন লেগে যায় তার মানে হাজার খানেক মানুষকে দেয়া যাবে!"

বাসায় আসার সময় আজকে যখন রাস্তার পাশে জবুথবু হয়ে বসে থাকা মানুষগুলোকে দেখলাম তখন অন্যদিনের মতো এত হতাশ হয়ে গেলাম না। মনে হলো সবাই মিলে এদের সাহায্য করার জন্যে এত পরিশ্রম করছে নিশ্চয়ই তাদের দুঃখের দিন শেষ হয়ে যাবে।

রাত্রি বেলা রিয়াজ মামা আমেরিকা থেকে ফোন করলেন। আম্মুর সাথে কথা বলে আমার সাথে কথা বললেন, আমি তাকে বন্যার খবর দিলাম। সবকিছু শুনে রিয়াজ মামা জিব দিয়ে চুক চুক শব্দ করে বললেন, "মানুষের এত কষ্ট, কিন্তু তারপরেও একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস লিটু?"

"কী মামা?"

"এই দেশের মানুষ তারপরেও কিন্তু বন্যাকে ভালবাসে। তুই খেয়াল করেছিস মানুষজন মেয়ের নাম রাখে বন্যা। কখনো তো ভূমিকম্প, না হয় সাইক্লোন, না হয় মহামারী নাম রাখে না! রাখে?"

কথাটা রিয়াজ মামা ভুল বলেন নাই। সত্যিই তাই, প্রতি বছর বন্যায়

মানুষের কত কষ্ট হয় তারপরেও আদর করে মেয়ের নাম রাখে বন্যা। বন্যা শব্দটাকে দেশে মানুষ মনে হয় ভালবাসে।

রিয়াজ মামা টেলিফোন রাখার আগে বললেন, বন্যায় সাহায্য পাঠানোর জন্যে কোনো ব্যাংক একাউন্ট থাকলে জানাতে, আমেরিকা থেকে টাকা তুলে পাঠাবেন।

পরদিন আবার আমরা রিলিফ কাজ করতে গেলাম। কী করতে হবে আজকে আমরা আগে থেকে জানি তাই নিজেরাই কাজ শুরু করে দিলাম। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আমরা নিজেদের ভিতরে কম্পিটিশন শুরু করে দিলাম। দেখতে দেখতে আমাদের সামনে খাবার স্যালাইনের পাহাড় জমে উঠল। এর প্রত্যেকটা কোনো-না-কোনো মানুষের কাজে লাগবে চিন্তা করেই আমার ভালো লাগতে থাকে। আগে কখনো এরকম কাজ করি নি, সব সময় নিজের জন্যে কাজ করেছি, এই প্রথম অন্যের জন্যে কাজ করছি! আসলে নিজের জন্যে কাজ করে কোনো আনন্দ হয় না, অন্যের জন্য কাজ করলে একটা অন্যরকম আনন্দ হয়। আমাদের তানিয়া কেন মাদার টেনিয়া হয়ে মানুষ জনের উপকার করে বেড়ায় সেটা এখন আমি অল্প অল্প বুঝতে শুরু করেছি।

বাসায় আসার সময় জাহাঙ্গীর ভাইকে জিজ্ঞেস করে ব্যাংকের একাউন্টটা জেনে এলাম, রিয়াজ মামা ফোন করলে তাকে জানাতে হবে। সত্যি সত্যি রিয়াজ মামা রাতে ফোন করলেন, একদিনের মাঝে নাকি দশ হাজার ডলার তুলে ফেলেছেন! আমি তাকে ব্যাংক একাউন্টের নাম্বার দিলাম, আধা ঘন্টা পর মামা ফোন করলেন টাকাটা নাকি পাঠিয়েও দিয়েছেন। আমি অবাক হয়ে বললাম, "এত রাতে তুমি কেমন করে পাঠালে?"

রিয়াজ মামা হা হা করে হেসে বললেন, "তোদের এখানে রাত বলে সারা পৃথিবীতে রাত হবে নাকি? এখানে ফকফকা দিন!"

আমার তখন মনে পড়ল, সত্যিই তো, আমেরিকা বাংলাদেশের ঠিক উল্টো দিকে। এখানে যখন রাত সেখানে তখন দিন।

টাকাটা পেয়ে জাহাঙ্গীর ভাই খুব খুশি, রিলিফের কাজ আরো বাড়িয়ে দিলেন। প্রত্যেক দিনই ট্রলার বোঝাই করে চাউল, ডাল, চিড়া, মোমবাতি কাপড়, ওষুধ খাবার স্যালাইন নিয়ে যেতে লাগল। এক একটা টিম রিলিফ নিয়ে সকাল বেলা বের হয়ে যেত, ফিরে আসত বিকেল বেলা। জাহাঙ্গীর ভাই একদিন আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা যাবে নাকি রিলিফ দিতে?"

www.MurchOna.com

শুনে আমরা লাফিয়ে উঠলাম, "যাব জাহাঙ্গীর ভাই! যাব!"

মাধুরী মাথা নেড়ে বলল, "বাসা থেকে পারমিশান দেবে না।"

জাহাঙ্গীর ভাই বললেন, "সেটা নিয়ে তোমরা চিন্তা করো না। যাবে কি না বলো।"

আমরা বললাম, "যাব! যাব!"

জাহাঙ্গীর ভাই বললেন, "সবাই সাঁতার জান তো?"

আমরা বললাম, "জানি।"

জাহাঙ্গীর ভাই বললেন, "ঠিক আছে।"

জাহাঙ্গীর ভাই খুব কাজের মানুষ, সত্যি সত্যি আমাদের সবার পারমিশান নিয়ে নিলেন। কাজটা খুব কঠিন হলো না কারণ ট্রলারে করে যাবে ঢাকা থেকে আসা দুই একজন সাংবাদিক আর টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান। তারা নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, কারণ তাদের যেন কোনো সমস্যা না হয় সেজন্যে সেই ট্রলারে থাকবে রাইফেলসহ দুইজন পুলিশ! এতরকম ব্যবস্থা থাকলে বাসা থেকে পারমিশান না দেয় কেমন করে? আমরা এতদিন থেকে এত খাটাখাটুনি করছি, সেই খাটা খাটুনিটুকু কারা পাচ্ছে দেখার তো একটা কৌতূহলও থাকে।

খুব সকাল বেলা আব্বু আমাকে ট্রলার ঘাটে নামিয়ে দিলেন। বেশ কয়েকটা ট্রলার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, সবাই মিলে সেখানে বড় বড় চাল ডাল চিড়ার বস্তা, ওষুধপত্র, কাপড় বোঝাই কার্টন তুলতে লাগল। কিছুক্ষণের মাঝে সাদিব সুমন এসে গেল। তারপর এলো মাধুরী আর তানিয়া। সবার শেষে এলো রতন। আমরা সবাই নদীর ঘাটে বসে দেখতে লাগলাম। সবকিছু তোলার পর জাহাঙ্গীর ভাই সবাইকে ট্রলারে উঠতে বললেন, যেটা সবচেয়ে বড় ট্রলার সেখানে সাংবাদিক ক্যামেরাম্যান আর পুলিশের সাথে আমরা উঠলাম। সাংবাদিকেরা এসেছে বন্যার উপর রিপোর্ট করতে তাই তারা যেটাই দেখছে সেটাই ছোট নোট বইয়ে লিখে ফেলছে। টিভি ক্যামেরাম্যান তাদের বড় ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছে।

ভোর আটটার ভেতর রওনা দেবার কথা ছিল কিন্তু সব কিছু রেডি করে রওনা দিতে দিতে নয়টা বেজে গেল। ট্রলার ছাড়ার পর আমি জাহাঙ্গীর ভাইকে বললাম, "আমরা এক ঘণ্টা লেট!"

জাহাঙ্গীর ভাই আমার দিকে চোখ মটকে গলা নামিয়ে বললেন, "আসলে একেবারে ঠিক টাইমে যাচ্ছি। আমার আসল টার্গেট ছিল সকাল নয়টা কাউকে সেটা বলি নাই!"

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

ট্রলারের ইঞ্জিন বিকট শব্দ করছে বলে আমরা ট্রলারের ছাদে উঠে গেলাম, সেখানে পা ছড়িয়ে বসার জায়গা আছে। বৃষ্টি না হলে বসার জন্যে জায়গাটা চমৎকার। আমরা ট্রলারের ছাদে বসে নদীর দুই তীরের দিকে তাকিয়ে থাকি, নদরি পানি অনেক ফুলে-ফেপে উঠে মানুষজনের বাড়িঘরের ভেতর ঢুকে গেছে! মানুষজনের এত কষ্ট, তার মাঝে ছোট বাচ্চাদের স্ফূর্তির শেষ নাই। একটা বড় গাছের ডালে উঠে সেখান থেকে পানিতে লাফিয়ে পড়ছে, দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীতে এর থেকে মজার বুঝি আর কিছু নেই।

রতন বলল, "মানুষ না হয়ে বান্দর হওয়াই উচিত ছিল।"

আমরা রতনের দিকে ঘুরে তাকালাম, জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?"

"দেখছিস না কী মজা! বান্দর হলে সব সময়েই গাছে থাকতাম! লেখাপড়া নাই, কী আনন্দ!"

রতনের কথাবার্তা সব সময়েই এই রকম তাই আমরা সেটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামালাম না। সুমন বলল, "তোর যখন লেখাপড়া এত অপছন্দ তাহলে কেন ছেড়ে দিস না?"

রতন নিজের বাম কানটা দেখিয়ে বলল, "এই দ্যাখ! বাবা টেনে কানের লতি কত লম্বা করেছে—আরো লম্বা করে ফেলবে!"

"কী খোকা-খুকুরা! তোমরা কী করছ?" গলার শব্দ শুনে আমরা মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখি একজন সাংবাদিক। নাকের নিচে ঝাঁটার মতন গোঁফ—যাদের গোঁফ এত বিচ্ছিরী তাদের গোঁফ রাখাই উচিত না।

আমরা মোটামুটি বড় হয়েছি, আজকাল কেউ আমাদের খোকা খুকু ডাকে না। প্রশ্নটা এমনি করেছে উত্তর দেয়ার দরকার আছে বলে মনে হয় না, তবুও ভদ্রতা করে উত্তর দিলাম। বললাম, "এই তো দেখছি!"

"চারিদিকে তো শুধু পানি। দেখার তো বিশেষ কিছু নাই। আমি তো বোর হয়ে গেলাম!"

বলে কী লোকটা! নৌকা যাচ্ছে, ট্রলার যাচ্ছে। নদীর তীরে ছোট ছোট বাচ্চারা লাফঝাপ দিচ্ছে, রাস্তার উপরে গরু বেঁধে রেখেছে সেটা হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে, ছোট একটা বাচ্চা মেয়ে নৌকা বেয়ে যাচ্ছে, কত কী আছে দেখার মতো! অথচ বলছে এখানে নাকি দেখার কিছু নাই! ঝাঁটার মতন গোঁফওয়ালা সাংবাদিকটা বলল, "আমার আরেকটা এসাইন্টমেন্ট ছিল এফ. ডি. সি তে সেইটাই নেওয়া উচিত ছিল। বসে বসে মোটা মোটা নায়িকাদের দেখতে পারতাম!" বলে লোকটা হা হা করে হাসতে লাগল যেন খুব মজার একটা কথা বলেছে।

www.MurchOna.com

সাংবাদিকটা ট্রলারের উপর কিছুক্ষণ হেঁটে আমাদের কাছে এসে বলল, "তা তোমরা কী মনে করে? পিকনিক করতে যাচ্ছ?"

আমার এত রাগ হলো বলার মতো না। মুখ শক্ত করে বললাম, "উঁহু। রিলিফ দিতে যাচ্ছি?"

"রিলিফ দিতে? তোমরা? এই বাচ্চা পুলাপান?" লোকটা আবার হা হা করে হাসতে লাগল যেন খুব একটা মজা হয়েছে।

মাধুরী বলল, "আমরা যত খাওয়ার স্যালাইন বানিয়েছি সেইটা এই পুরো ডিস্ট্রিক্টে সবাইকে দেওয়া হয়েছে!"

"তাই নাকি?"

সুমন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।" তারপর আমাকে দেখিয়ে বলল, "এই যে লিটু, সে আমেরিকা থেকে দশ হাজার ডলার এনেছে রিলিফের জন্যে। এই যে ট্রলারে করে জিনিসপত্র নিচ্ছে তার সব টাকা লিটু জোগাড় করেছে।"

"তাই নাকি?" মানুষটার চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

সত্যি কথা বলতে কী টাকাটা আমি জোগাড় করি নাই, টাকাটা দিয়েছেন রিয়াজ মামা। কিন্তু এটাও সত্যি রিয়াজ মামা আমার কথা শুনেই টাকাটা জোগাড় করে দিয়েছেন, কাজেই সুমন খুব একটা মিথ্যা কথা বলে নাই।

গোঁফওয়ালা সাংবাদিক কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল তারপর নিচে নেমে গেল। সুমন বলল, "আমাদের কোনো কথা বিশ্বাস করে নাই, তাই নিচে জাহাঙ্গীর ভাইকে জিজ্ঞেস করতে গেছে।"

মাধুরী হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, "ঠিকই বলেছিস!"

ট্রলারটা এতক্ষণে নদীটা পার হয়ে বড় একটা হাওরে এসে ঢুকেছে। এখন যতদূর চোখ যায় চারিদিকে শুধু পানি। পানি যে খুব গভীর নয় সেটা বোঝা যায়, মাঝে মাঝেই দেখা যায় একটা দুইটা গাছ, অর্ধেক পানিতে ডুবে আছে।

আকাশে খুব সুন্দর মেঘ, ঘন কালো রং। দেখে মনে হয় বুঝি যে-কোনো মুহূর্তে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমে আসবে। কিন্তু আসছে না। শুধু বাতাসে একটা ভেজা ভেজা গন্ধ। আমরা চুপ চাপ বসে রইলাম। ঠিক কী কারণ জানি না আমাদের মনে হচ্ছিল এখন বুঝি কোনো কথা বলা উচিত না, এখন চুপচাপ বসে থাকার কথা। আমি মাঝে মাঝে ক্যালেন্ডারে বিদেশের ছবি দেখেছি, নীল হ্রদ, পানির ঝরনা—কত কিছু। কিন্তু একটা বিশাল হাওরের উপর দিয়ে একটা ট্রলারে যেতে যেতে আমার মনে হতে লাগল পৃথিবীতে কোথাও এত সুন্দর দেশ নেই। আমার দেশটাই বুঝি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দেশ!

www.MurchOna.com

আমরা যে গ্রামটিতে রিলিফ নিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম তার নাম কালাবুটি, গ্রামটি এত দূরে যে কেউ সেখানে রিলিফ নিয়ে যায় না। আমার যখন সেখানে পৌঁছালাম তখন দুপুর হয়ে গেছে। গ্রামটা একটা দ্বীপের মতন চারপাশে পানি মনে হয় তার মাঝে কোনোভাবে ভেসে আছে। আমাদের ট্রলারের শব্দ শুনে গ্রামের সব মানুষ তীরে এসে ভীড় করেছে। কাদার মাঝে পানির মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। আমারা অবাক হয়ে দেখলাম, মানুষগুলো না খেতে পেয়ে কেমন যেন শুকিয়ে গেছে। চোখে মুখে এক ধরনের দিশেহারা ভাব, চোখগুলো জ্বল জল করছে। ট্রলারটা তীরে এসে ভীড়তেই গ্রামের সব মানুষ মনে হয় ট্রলারের উপর ঝাপিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে লাগল। মনে হতে লাগল না খেতে পেয়ে মানুষগুলো বুঝি পাগল হয়ে গেছে, পারলে তারা বুঝি এখনই আামদের ট্রলারের সবকিছু লুট করে নেবে।

আমরা ট্রলারের ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছি। পুরো দৃশ্যটা দেখতে এত কষ্ট লাগছিল যে বলার নয়। আমরা কত সুন্দর জামা-কাপড় পরে মজা করে রিলিফ দেওয়া দেখতে এসেছি। আর ঠিক আমার বয়সী ছেলেমেয়েরা ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরে একটু খানি খাবার, একটু খালি রিলিফের জন্যে হুটোপুটি করছে।

"একেবারে জংলী মানুষের মতো!" গলার স্বর শুনে আমি ঘুরে তাকালাম, ঝাঁটার মতো গোঁফওয়ালা সাংবাদিক। আমার দিকে তাকিয়ে মানুষটা একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, "ভাগ্যিস সাথে আর্মড পুলিশ আছে। তা না হলে মনে হয় এতক্ষণে ট্রলার লুট করে নিতো!"

ট্রলারে ওঠার জন্যে মানুষগুলো হুটোপুটি করছে, কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে যেন কেউ উঠতে না পারে। জাহাঙ্গীর ভাই ট্রলারের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "শুনেন! আপনারা আমার কথা শুনেন।"

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সাংবাদিক বলল, "এরা কী কোনো কথা শুনবে? শুনবে না। আমাদের এখানে আসাই ঠিক হয় নাই।"

মানুষগুলো ট্রলারের কাছে আসার জন্যে একজনের সাথে আরেকজন ধস্তাধস্তি করছে, কাদা-মাটিতে একেকজন মাখামাখি হয়ে গেছে, দেখতে কী ভয়ানক কষ্ট লাগছে সেটা আর বলার মতো নয়। এর মাঝে ঝাঁটার মতন গোঁফওয়ালা সাংবাদিক না খেতে পাওয়া গরিব মানুষগুলোকে নিয়ে আজেবাজে কথা বলতে লাগল। আমার ইচ্ছে হলো মানুষটাকে ধাক্কা দিয়ে হাওরের পানিতে ফেলে দিই।

জাহাঙ্গীর ভাই আবার বললেন, "আপনারা একটু শান্ত হন, তা না হলে আমরা রিলিফ দেওয়া শুরু করতে পারব না।"

যারা এসেছে তাদের অনেকের হাতেই থালা, বাসন, বাটি। তারা সেগুলো উঁচু করে কাছে আসার চেষ্টা করতে লাগল। জাহাঙ্গীর ভাই হাত তুলে সবাইকে থামানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত মানুষগুলো একটু শান্ত হলো, জাহাঙ্গীর ভাই তখন বললেন, "আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করি?"

নদী তীরে কাদামাটি মাখা একজন বলল, "করেন।"

"মনে করেন আমার কাছে খালি একজন মানুষকে দেওয়ার মতো রিলিফ আছে। তাহলে সেইটা কাকে দেওয়া উচিত?"

সবাই চিৎকার করতে লাগল "আমাকে। আমাকে।"

গোঁফওয়ালা সাংবাদিক ফিস ফিস করে বলল, "জাস্ট লাইক এনিমেল! ক্রুড এন্ড সেলফিস!"

জাহাঙ্গীর ভাই মাথা নেড়ে বললেন, "না। যদি আমার কাছে শুধু একজনকে দেওয়ার মতো রিলিফ থাকে সেইটা দেওয়া উচিত এই গ্রামে যে সবচেয়ে গরিব, সবচেয়ে দুর্বল, সবচেয়ে ক্ষুধার্ত্ত, সবচেয়ে অসহায় তার। সেইটা কে?"

যে মানুষগুলো এতক্ষণ হুটোপুটি করছিল তারা এবারে থেমে গেল, একজন আরেকজনের দিকে তাকাল তারপর নিজেরা নিজেদের ভেতরে কথা বলল, তারপর বলল, "করিম বেওয়া।"

"সে কোথায়?"

একজন বলল, "ঐ যে দূরে খাড়ায়া আছে।"

"তাহলে তাকে আগে রিলিফ না দিয়ে আপনারা সবাই কেন নিতে চাচ্ছেন?"

মানুষগুলি চুপ করে রইল। জাহাঙ্গীর ভাই বললেন, "আমরা ট্রলার থেকে সব রিলিফ নামাচ্ছি। আপনারা সরে যান, আমাদের একটু নামার জায়গা করে দেন। তারপর যারা সবচেয়ে গরিব, সবচেয়ে দুর্বল সবচেয়ে বেশি যাদের রিলিফ দরকার তাদের আগে নিয়ে আসেন। তাদেরকে দেওয়ার পর যদি বাকি থাকে অন্যেরা পাবে।"

একজন জোয়ান মতো মানুষ জিজ্ঞেস করল, "যদি না থাকে?"

"তাহলে অন্যেরা পাবে না।"

মানুষগুলো জাহাঙ্গীর ভাইয়ের কথা শুনে নিজেরো নিজেরা একটু কথা বলল তারপর সবাই সরে গেল। জাহাঙ্গীর ভাই কয়েকজনকে নিয়ে রিলিফ নামিয়ে একটা শুকনো জায়গায় রাখতে লাগলেন। আমি দেখতে পেলাম মানুষগুলো বুড়ো, দুর্বল, অসুস্থ গরিব মানুষগুলোকে নিজেরাই খুঁজে খুঁজে বের করে লাইন করিয়ে দাঁড়া করাচ্ছে। যারা শক্ত সমর্থ, জোয়ান তাদেরকে সরিয়ে দিচ্ছে। হাড়

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

জিরজিরে বাচ্চাগুলোকেও আলাদা একটা লাইনে দাঁড়া করিয়ে দিল। জাহাঙ্গীর ভাই খুশি হয়ে বললেন, "ভেরি গুড! এখন হচ্ছে আমাদের খারাপ সময় আমাদের কষ্টের সময়। এখন আমাদের একজন আরেকজনকে সাহায্য করতে হবে। যারা সবচেয়ে দুর্বল তারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করতে পারছে না। তাদেরকে অন্যদের সাহায্য করতে হবে।"

মানুষগুলো কোনো কথা না বলে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জাহাঙ্গীর ভাই অন্যদের নিয়ে চাউল ডাল চিড়া ভাগ করে দেয়া শুরু করলেন। কারো ভেতরে কোনো হুটোপুটি নেই, সবাই শান্ত হয়ে লাইন ধরে এগুচ্ছে। দেখলে কে বলবে একটু আগে এরাই একটুখানি রিলিফের জন্যে নিজেদের ভেতর মারামারি করছিল। গ্রামের না খেতে পাওয়া মানুষগুলা যখন নিজেরাই ঠিক করে নিয়েছে যার সবচেয়ে বেশি রিলিফের দরকার সে যাবে সবার আগে তখন আর কারো সমস্যা নেই। আমার পাশে গোঁফওয়ালা সাংবাদিক দাঁড়িয়ে আছে, এখন সে আর কথা বলছে না। মানুষগুলো যখন নিজেদের ভেতর ঝগড়াঝাটি করছিল তখন "এনিমেল", "সেলফিস" এইসব বলে গালি দিয়েছে, এখন যখন সবাই সুন্দর করে রিলিফ নিচ্ছে এখন কিছু বলছে না! কত বড় দুই নম্বুরী মানুষ!

তানিয়া বলল, "আয় আমরা নিচে যাই। গিয়ে জাহাঙ্গীর ভাইকে সাহায্য করি।"

আমরা বললাম, "চল।"

ট্রলার থেকে নামতে গিয়ে আমাদের জুতো কাদা-পানিতে মাখামাখি হয়ে গেল, আমরা সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। জাহাঙ্গীর ভাইয়ের কাছে গিয়ে আমরা তার সাথে সাথে চাল ডাল চিড়া ভাগাভাগি করে দিতে শুরু করলাম।

দুপুরের দিকে যখন আমরা রিলিফ দেয়া শেষ করে ট্রলারে উঠছি তখন দুইজন থুরথুরে বুড়ী এসে হাজির। তারা কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে আমরা ঠিক শুনতে পেলাম না।

ঝাঁটার মতো গোফওয়ালা সাংবাদিক জাহাঙ্গীর ভাইকে বলল, "এই দুইজন রিলিফ নিয়েছে, আমার স্পষ্ট মনে আছে। আবার এসেছে—দেখেন কাণ্ডটা। এত বুড়ী কিন্তু কত লোভ! এক পা কবরে, তবু লোভ যায় না!"

জাহাঙ্গীর ভাই বললেন, "না রিলিফ নিতে আসে নাই। অন্য কিছু বলছে।"

"কী বলছে?"

জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সাথে এবারে আমরাও বুড়ী দুইজনের কথা শোনার চেষ্টা করলাম। একজন বলল, "বাবারা, তোমরা সারাদিন পরিশ্রম করছ, তোমাদের

www.MurchOna.com

নিশ্চয়ই খিদা পাইছে। আমরা চাইরডা খিচুড়ি রানছি, খাবা, চলো।"

জাহাঙ্গীর ভাই বললেন, "সে কি! আপনাদের রিলিফের চাল ডাল দিয়েছি, সেটা দিয়ে আপনারা আমাদের জন্যে খিচুড়ি রান্না করে ফেলেছেন মানে?"

"তোমাদের খেতে হবে না বাবা?"

"আমরা খাব। ট্রেলারে খাবার আছে।"

"আমাদের সাথে একটু খাও বাবা। আমাদের ভালো লাগবে।"

আমি ঝাঁটা গোঁফের সাংবাদিকের দিকে তাকালাম, তার মুখটা কালো হয়ে আছে। তার পৃথিবীটাতে সবাই খারাপ, যখন সে কোনো ভালো মানুষ দেখে তার হিসেবে গোলমাল হয়ে যায়। এখন আবার তার হিসাব গোলমাল হয়ে গেছে। কী করবে বুঝতে পারছে না।

বুড়ী বলল, "যাবা না খেতে?"

জাহাঙ্গীর ভাই বললেন, "ঠিক আছে! কে কে যাবে খিচুড়ি খেতে।"

আমি বললাম, "আমি!"

মাধুরী আর তানিয়া বলল, "আমি!"

সাদিব আর সুমন বলল, "আমি।"

রতন মনে হয় বলতে চাচ্ছিল না কিন্তু যেহেতু আমরা সবাই বলে ফেলেছি, তাই সেও বলল, "আমি।"

খিচুড়িটা খেতে খুব ভালো ছিল না। তা ছাড়া সবসময়েই খিচুড়ির সাথে অন্য কিছু খেয়েছি, বেগুন ভাজা ডিম না হয় মাংশ। আজকে শুধু খিচুড়ি সাথে কিছু নেই। সেই খিচুড়িতে লবণ কম, একটু বেশি ল্যাদল্যাদা—কিন্তু কেন জানি না আমাদের মনে হলো এত মজার খিচুড়ি জীবনে কখনো খাই নাই। তানিয়া ঠিকই বলেছে এই পৃথিবীতে মানুষের ভালবাসা সবকিছু অন্যরকম করে দেয়।

www.MurchOna.com

৭.

কোনো কোনো মানুষের চেহারা থাকে যাকে দেখলেই মনে হয় মানুষটা ভালো না, ঝাঁটার মতো গোঁফের মানুষটা সেরকম—তাকে দেখেই আমরা সবাই অপছন্দ করছি আর দেখা গেছে মানুষটা আসলেই ভালো না। আবার কোনো কোনো মানুষের চেহারা দেখলেই মনে হয় মানুষটা বুঝি ভালো, যে মাঝিটা আমাদের ট্রলার চালাচ্ছে সেই মানুষটা এরকম। ট্রলারের হাল ধরে সে হাওরের ভেতর দিয়ে ট্রলার চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার চেহারার মাঝে কিছু একটা আছে যেটা দেখলেই ভালো লাগে। বয়স্ক মানুষ, মাথার চুল পেকে যাচ্ছে, মুখে খোচা খোচা দাড়ি, পরনে রঙ উঠে যাওয়া একটা শার্ট আর লুঙ্গি। ঘাড়ে একটা গামছা! মানুষটা আকাশের দিকে তাকিয়ে ট্রলারের হাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তার সাথে কম বয়সী আরো একজন আছে—তাকে একবার হালটা ধরিয়ে দিয়ে ট্রলারের ছাদের দিকে সে কিছু একটা দেখতে এলো।

ঝাঁটার মতো গোঁফের সাংবাদিক ট্রলারের মাঝিকে জিজ্ঞেস করল, "ফিরে যেতে আর কতক্ষণ লাগবে?"

"তিন ঘণ্টার মাঝে চলে যাব।"

"তি-ন-ঘ-ন্টা!" সাংবাদিক খুব বিরক্ত হলো বলে মনে হলো। "এতক্ষণ লাগবে কেন?"

"আমরা তো অনেক দূর চলে এসেছি, সেই জন্যে।"

সাংবাদিক চারিদিকে তাকিয়ে বলল, "চারিদিকে পানি, কোনদিকে যাচ্ছি কিছুই তো বুঝতে পারছি না! আবার রাস্তা হারাবেন না তো?"

মাঝি হাসল, বলল, "রাস্তা থাকলে মানুষ রাস্তা হারায়। এই খানে রাস্তা নাই—রাস্তাটা হারাবো কীভাবে?"

আমরা হি হি করে হেসে উঠলাম আর সেটা শুনে মনে হয় সাংবাদিকের একটু

www.MurchOna.com

অপমান হলো, বলল, "পানির মাঝে রাস্তা থাকে না বলেই তো বলছি। কোনদিকে যেতে গিয়ে কোনদিকে চলে যাবেন।"

মাঝি মাথা নাড়ল, বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না। আমি এই এলাকার মানুষ। পুরো এলাকাটা আমি হাতের তালুর মতো চিনি।"

"কেমন করে চিনবেন? কিছু তো নাই চেনার, খালি পানি আর পানি।"

মাঝি হাসে, বলে, "আপনার কাছে মনে হয় খালি পানি। আমার কাছে অনেক কিছু—ঐ দেখেন বড় জারুল গাছটা—আরেকটু দূরে তাকান, দেখেন পানির নিচে একটা রাস্তা। পিছনে তাকান দেখেন দুইটা টিলা, বাম পাশে তাকান ঐ দূরে কালিহাটি গ্রাম, আপনাদের চোখে পড়ে না, আমার চোখে পড়ে।"

"আমি তো কিছুই দেখি না।" সাংবাদিক চোখ কুচকে দূরে তাকিয়ে বলল "ঐ দূরে কালো মতন ঐটা কী?"

"ঐটাও একটা গ্রাম। কাঞ্চনপুর।"

মাধুরী বলল, "কী সুন্দর নাম। কাঞ্চনপুর।"

মাঝি হাসল, বলল, "আগে এই গ্রামের নাম ছিল বিরইপুর। স্বাধীনতার পর গ্রামের মানুষ নাম দিয়েছে কাঞ্চনপুর।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম "কেন? নামটা বদলেছে কেন?"

"কাঞ্চন নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল এই গ্রামে! মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছিল তার নামে নাম কাঞ্চনপুর।"

ঝাঁটাওয়ালা গোঁফের সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল, "কেমন করে শহীদ হয়েছিল কাঞ্চন?"

মাঝি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "একটা লঞ্চে করে পাকিস্তানি মিলিটারিরা আসছিল, গ্রামের কাছে খালে যখন পৌঁছাল কাঞ্চন তখন লঞ্চের ভেতরে গ্রেনেড চার্জ করেছিল। তারপর..."

"লঞ্চের ভেতরে কেমন করে গ্রেনেড চার্জ করল? দূর থেকে ছুড়ে মেরেছিল?"

"না।" মাঝি মাথা নেড়ে বলল, "খালের পাশে কচুরিপানার নিচে ডুবে লুকিয়ে ছিল। যখন কাছাকাছি এসেছে মুখ দিয়ে পিন খুলে দুইটা গ্রেনেড ভিতরে ফেলে দিয়েছে—"

"তারপর..."

"গ্রেনেড ফেটে ভিতরে তুলকালাম অবস্থা। মিলিটারি তখন গুলি শুরু করেছে—একটা এসে লেগেছে কাঞ্চনের পিঠে, তীর পর্যন্ত আসতে পারে নাই আগেই ডুবে গেছে।"

www.MurchOna.com

সাংবাদিক মানুষটি মাথা নাড়ল বলল, "আপনার গল্পে কিছু সমস্যা আছে।"

মাঝির মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল, বলল, কী সমস্যা?"

"আপনি বললেন, মুখ দিয়ে গ্রেনেডের পিন খুলেছে। কেমন করে সেটা জানেন? হয়তো হাত দিয়ে টেনে খুলেছে। আর গুলিটা ঘাড়ে লেগেছে সেটা কেমন করে জানেন? হয়তো মাথায় লেগেছে কিংবা পেটে লেগেছে!"

মাঝি বলল, "গুলিটা ঘাড়েই লেগেছে। গুলি লাগার পর মুখ দিয়ে খালি একটা শব্দ করেছে তারপর শেষ। আর গ্রেনেডের পিনটা কাঞ্চন মুখ দিয়েই খুলেছে।"

"আপনি কেমন করে জানেন?"

মাঝি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি জানি। আমি আর কাঞ্চন এক সাথে ছিলাম। কাঞ্চন দুইটা গ্রেনেড চার্জ করেছে—আমি দুইটা।"

আমি চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি মুক্তিযোদ্ধা?"

মাঝি মাথা নাড়ল, মুখে কিছু বলল না। মাধুরী বলল, "কী আশ্চর্য—একজন সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা!"

সাদিব জিজ্ঞেস করল, "আপনি আরো যুদ্ধ করেছেন?"

তানিয়া জিজ্ঞেস করল, "আপনার ভয় করত না?"

সুমন জিজ্ঞেস করল, "কাঞ্চন আর আপনি বন্ধু ছিলেন?"

রতন খালি কোনো প্রশ্ন করল না, মুখটা সূচালো করে শিস দেবার মতো একটা শব্দ করল।

মাঝি হাসল, বলল, এতগুলো প্রশ্ন এক সাথে! দাঁড়াও একটা একটা করে উত্তর দেই। "হ্যাঁ আমি আরো কিছু যুদ্ধ করেছি। হ্যাঁ যুদ্ধ শুরু হবার আগে ভয় করত। প্রথম গুলিটা করার পর হঠাৎ করে ভয়টা চলে যেত। কাঞ্চন শুধু আমার বন্ধু না, সে আমার ছোট ভাইয়ের মতো ছিল। একটু পাগল কিসিমের মানুষ ছিল। অসম্ভব সাহস ছিল কাঞ্চনের বুকের ভিতরে কোনো ভয় ডর ছিল না। গুলিটা খাবার পর আমি তারে ধরলাম, আমার হাতের মাঝে ধরফর করে দমটা চলে গেল।" মাঝির মুখটা হঠাৎ কেমন যেন দুঃখী মানুষের মতো হয়ে যায় দেখেই মনে হয় যেন হঠাৎ করে পুরো দৃশ্যটা তার চোখের সামনে ভাসছে।

মাধুরী বলল, "আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটা গল্প বলবেন, প্লিজ।"

"যুদ্ধের গল্প?"

"হ্যাঁ। প্লিজ।"

"এইগুলি তো আসলে গল্প না, সত্যি ঘটনা।"

www.MurchOna.com

"বলবেন একটা সত্যি ঘটনা?"

মাঝি হাওরের পানির দিকে তাকিয়ে বলল, "কোনটা বলি? যেটাই বলি তার মাঝে একটা দুঃখের ঘটনা থাকে। দুঃখের কথা শুনতে কার ভালো লাগে?"

"বলেন, তবু শুনি।"

মাঝি কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল, তারপর বলল, "বর্ষাটা যখন শুরু হয়েছে তখন একদিন আমাদের গ্রামে মিলিটারি এসেছে। আমাদের ভাটি অঞ্চল মিলিটারি আসার একটা মাত্র উপায় সেটা হচ্ছে নৌকা করে আসা। আমাদের গ্রামে তখন মুক্তিযোদ্ধা বলতে আমরা দুইজন, আমি আর কাঞ্চন—কাঞ্চন তখনো বেঁচে আছে। আমাদের দলের অন্য সবাই গেছে আরেকটা অপারেশনে দূরে একটা থানায়, আমাদের দুইজনকে রেখে গেছে। এতগুলো মিলিটারি একসাথে চলে এসেছে, আমরা তো আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারি না। তাই গ্রামের মাঝে লুকিয়ে থাকলাম। আমাদের গ্রামে কোনো জামাতে ইসলামী ছিল না, কোনো দালাল ছিল না, তাই আমাদের দুইজনকে কেউ ধরিয়ে দিল না।"

"গ্রামের একটা বাড়ির পিছনে জঙ্গলের ভিতরে লুকিয়ে থেকে শুনতে পেলাম মিলিটারির দল গ্রামে এসে বাড়িতে আগুন লাগাচ্ছে। দাউ দাউ করে কয়েক ঘর বাড়ি পুড়ে গেল। মিলিটারি আর রাজাকার মিলে তখন লুটপাট শুরু করল। কয়েকটা ছাগল কয়েকটা মুরগি আর কমবয়সী কয়েকটা মেয়ে নিয়ে তারা নৌকায় উঠল। মেয়েগুলো আমাদের গ্রামের মেয়ে। একজনের বিয়ে হয়ে গেছে একটা ছোট বাচ্চা আছে, অন্য দুইজনের তখনো বিয়ে হয় নাই। মুরগি ছাগল আর মেয়ে তিনটারে নিয়ে যখন নৌকা রওনা দিয়েছে তখন একটা মেয়ের বাবা পাগলের মতো আমার কাছে ছুটে এসেছে, তার চেহারাটা দেখলে বুকটা ভেঙে যায়। আমার হাত ধরে হাউমাউ করে কাঁদে আর বলে, "আমার মেয়ে। আমার মেয়ে। আমার মেয়ে..."

"আমি আর কাঞ্চন তখন একজন আরেকজনের দিকে তাকাই। কয়েক সপ্তাহের একটা ট্রেনিং দিয়ে আমাদের পাঠিয়েছে। অস্ত্র বলতে দুইজনের দুইটা থ্রি নট থ্রি রাইফেল আর কয়েকটা গুলি। পাকিস্তানি মিলিটারির কাছে চাইনিজ এল এম জি, গ্রেনেড আরো কত রকম অস্ত্র। এই অস্ত্র নিয়ে আমরা তাদের সাথে কী যুদ্ধ করব? কিন্তু একজন বাবা যখন তার মেয়ের জন্য আমাদের হাত ধরে হাউ মাউ করে কাঁদে, তখন তো আমরা বসে থাকতে পারি না। আমাদের তো কিছু একটা করতে হয়—তাই আমি আর কাঞ্চন দুইজন আমাদের থ্রি নট থ্রি রাইফেল নিয়েই দৌড়ালাম নদীর দিকে। নদীর পাড়ে ঝোপ জঙ্গল সেইখানে লুকিয়ে

লুকিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে আছি, তখন দেখি মিলিটারির নৌকাটা আসছে। নৌকা বেশি বড় না, তার মাঝে তিনটা মেয়ে, দশ-বারোটা ছাগল, কুড়ি-পঁচিশটা মুরগি, চারজন রাজাকার আর ছয়জন মিলিটারি। পাকিস্তানি মিলিটারি। বুড়া এক মাঝি নৌকাটা বেয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আজ থেকে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের ঘটনা, তখন তো আর এইরকম ট্রলার নৌকা ছিল না। বৈঠা দিয়ে নৌকা বাইতে হতো।"

"আমি আর কাঞ্চন জঙ্গলের আড়াল থেকে রাইফেল এইম করি, কিন্তু সুবিধা করতে পারি না। এত দূর থেকে গুলি করলে কারো গায়ে গুলি লাগাতে পারব না। মিলিটারিরে মারতে গিয়ে হয়তো একটা মেয়েকেই মেরে ফেলব। যুদ্ধ করার জন্যে থ্রি নট থ্রি রাইফেল খুব কাজের হাতিয়ার না!"

"নৌকাটা যখন কাছাকাছি আসছে তখন আমি মেয়েগুলোর কান্না শুনতে পেলাম। আহারে কান্না—সেই কান্না শুনে আমার বুকটা ভেঙে গেল। মনে মনে খোদারে বলি, "খোদা তোমার দুনিয়ায় তুমি এত বড় অবিচার সহ্য করো কেমন করে?"

"ঠিক তখন আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসলো। আমার নালিশটা শুনে খোদাই মনে হয় বুদ্ধিটা দিয়েছে। আমি কাঞ্চনরে বললাম, "কাঞ্চন, আয় আমি আর তুই গুলি শুরু করি।" কাঞ্চন বলল, "কোথায় গুলি করবি?" আমি বললাম, "ঐ হারামজাদাদের মাথার উপর দিয়ে!" কাঞ্চন জিজ্ঞেস করল, "মাথার উপরে গুলি করলে কী লাভ?" আমি বললাম, গুলি করেই দেখনা কী লাভ হয়।" তারপর বিসমিল্লাহ্ বলে দুইজন ট্রিগারে টান দিলাম। বেশি না মাত্র চার পাঁচটা গুলি করছি তখন যা একটা কাণ্ড ঘটল সেটা আর বলার মতো না। সবার প্রথম রাজাকারের বাচ্চা রাজাকারেরা "বাবারে মারে" বলে হাতের রাইফেল ফেলে পানির মাঝে লাফ দিল, তারপর লাফ দিলো মাঝি! নদীর মাঝখানে নৌকা তখন ঘুরপাক খায়। তখন আমাদের মেয়ে তিনটা পানির মাঝে লাফ দিলো। গ্রামের মেয়ে জন্মের পর থেকে পানির সাথে সম্পর্ক! সবাই মাছের মতো সাঁতার কাটে, নৌকা থেকে লাফ দিয়ে ডুবসাঁতার দিয়ে তিনজন চোখের পলকে তিনদিকে পালিয়ে গেল। নৌকার মাঝে তখন আধ ডজন মিলিটারি এক ডজন ছাগল আর দুই ডজন মুরগি।

"মিলিটারির বাচ্চা মিলিটারি আসছে মরুভূমির দেশ থেকে বাপের জন্মে পানি দেখে নাই। নদীর মাঝখানে যখন নৌকা ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে তখন ছাগলের ডাক আর মিলিটারির ডাক একরকম শোনায়। আমি আর কাঞ্চন তখন

www.MurchOna.com

নিশানা করে গুলি করি! একটা গুলি যদি করি মিলিটারির দিকে তাহলে দুইটা করি নৌকার দিকে! নৌকার মাঝে ফুটো হয়ে ভুস ভুস করে পানি ওঠা শুরু করল। মিলিটারির বাচ্চা মিলিটারিরা বাপ বাপ করে চিৎকার করে, আর লাফায় কিছু বোঝার আগে পানি উঠে নৌকা গেল ডুবে। আর বদমাইসের বাচ্চা মিলিটারি সবগুলি একেবারে মার্বেলের মতো ডুবে গেল! একটাও বেঁচে আসতে পারে নাই।"

গল্প শেষ করে মাঝি একটু একটু হাসে। তানিয়া জিজ্ঞেস করল, "মেয়েগুলোর কী হলো?"

"সাঁতরে তীরে এসে বাবা মা আর বোনদের ধরে সে কী কান্না।"

রতন জিজ্ঞেস করল, "আর রাজাকার?"

"সেইগুলি যখন সাঁতার দিয়ে তীরে উঠেছে তখন তাদের ধরে সে কী মার! মিলিটারির উপরে যত রাগ রাজাকারের ওপর রাগ তার থেকে দশ গুণ বেশি!"

"তারপর কী হলো?"

"কী আর হবে! পরের দিনই মিলিটারির একটা বড় দল আসছে লঞ্চে করে। থানার ওপরে অপারেশন করে আমাদের দলটাও তখন চলে আসছে। নদীর মুখে সে বিশাল ফাইট—"

মাঝির কাছ থেকে আমরা সেই বিশাল ফাইটের গল্পটাও শুনতে চাইছিলাম কিন্তু ঠিক তখন দেখলাম একটা বড় ট্রলার আমাদের দিকে আসছে। কাছাকাছি এসে সেটা আমাদের থামানোর ইঙ্গিত করল। আমাদের মাঝি হাল ধরতে এগিয়ে গিয়ে ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দেয়। দুইটা ট্রলার পাশাপাশি এসে দাঁড়াল তখন আমরা শুনলাম বড় ট্রলার থেকে একজন জোরে জোরে কথা বলছে, কথাগুলো স্পষ্ট শোনা গেল না, "বদি ডাকাত" "পাবলিক" "পিটুনি" এরকম কয়েকটা শব্দ শুধু শুনতে পেলাম। মানুষগুলো কী নিয়ে আলোচনা করছে আমরা একটু শোনার চেষ্টা করলাম, খানিকক্ষণ চেষ্টা করে আমরা বুঝতে পারলাম যে কাছাকাছি কোথাও কোনো একটা গ্রামে খুব ভয়ংকর একটা ডাকাতের দল এসেছিল, তাদের সর্দারের নাম বদি ডাকাত। গ্রামের মানুষ তাদের এক দুইজনকে ধরে ফেলে শক্ত পিটুনি দিয়েছে, অন্যেরা কোনোমতে পালিয়ে গেছে। গোলাগুলি হয়েছে গ্রামের মানুষ বেশ কয়েকজন না কী আহত হয়েছে। তাদের হাসপাতালে নিতে হবে। আমাদের ট্রলারে কয়েকজন পুলিশ আছে জেনে তাদেরকে নিয়ে সেই গ্রামে যেতে চায়।

পুলিশ মাথা চুলকে সাংবাদিকের দেখিয়ে বলল, "কিন্তু আমাদের যে এই

www.MurchOna.com

স্যারদের সাথে ডিউটি!"

ঝাঁটার মতো গোঁফওয়ালা সাংবাদিক বলল, "আমরা যাব চলেন। পাবলিক এসে ডাকাতদের ধরে ফেলে এটা তো সাংঘাতিক ব্যাপার। পত্রিকায় ভালো নিউজ হবে!"

জাহাঙ্গীর ভাই মাথা চুলকে বললেন, "কিন্তু জায়গাটা তো অনেক দূরে, যেতে দুই ঘণ্টা ফিরে আসতে আরো দুই ঘণ্টা। অনেক রাত হয়ে যাবে।"

সাংবাদিক বলল, রাত হলে ক্ষতি কি! আমরা সাংবাদিক আমাদের দরকার ভালো নিউজ! নিউজ কি আর দিন রাত হিসেব করে আসে? যখন যেভাবে আসে সেভাবেই নিতে হবে। দিনে এলে দিনে—রাতে এলে রাতে!"

জাহাঙ্গীর ভাই বললেন, "আমি সেটা বলছি না। আমাদের সাথে কয়েকটা বাচ্চাকাচ্চা আছে—তাদের বাবা মা'কে বলে এনেছি সন্ধ্যের আগে বাসায় পৌঁছে দেবো।"

সবাই তখন আমাদের দিকে তাকালো এবং তাদের চোখ-মুখের ভাব দেখে মনে হলো সন্ধ্যার আগে বাসায় পৌঁছাতে হবে বলে সবাই আমাদের ওপর খুব বিরক্ত হয়েছে!

বড় ট্রলারটার একজন মানুষ মোটা গলায় বলল, "এইটা কোনো সমস্যা না। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ঐ ট্রলারটা চলে যাক। যারা যেতে চায় আমাদের সাথে চলুক। আমরা যত রাত হোক পৌঁছে দেবো।"

শুনে সবাই আনন্দের মতো একটা শব্দ করল। জাহাঙ্গীর ভাই তার দলের একজনকে বললেন, "রাজু তুমি তাহলে তানিয়ার দলটার সাথে থাকো..."

রাজু মুখটা ভোতা করে বলল, "কিন্তু আমিও যেতে চাচ্ছিলাম। বদি ডাকাতের এত নাম শুনেছিলাম..."

"কিন্তু বদি ডাকাত ধরা পড়েছে সেটা তো কেউ শিওর না—"

"তবুও দেখতে চাচ্ছিলাম।"

"ঠিক আছে তাহলে কাদের তুমি যাও তানিয়াদের সাথে..."

কাদের নামের ছেলেটা বলল, "প্লিজ জাহাঙ্গীর ভাই আমিও বদি ডাকাত দেখতে চাই।"

"কিন্তু তানিয়ার দলটাকে তাহলে কে নিয়ে যাবে?"

তানিয়া বলল, "আমাদের কাউকে নিয়ে যেতে হবে না। আমরা নিজেরা নিজেরা চলে যাব!"

"নিজেরা নিজেরা চলে যাবে মানে?"

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

"আমাদের সাথে আছেন একজন মুক্তিযোদ্ধা মাঝি! আমরা যুদ্ধের গল্প শুনতে শুনতে চলে যাব।"

আমরা সবাই মাথা নাড়লাম, বললাম, "আমাদের জন্যে কারো চিন্তা করতে হবে না। আমরা নিজেরা নিজেরা চলে যাব।"

জাহাঙ্গীর ভাই বললেন, "কিন্তু..."

মাঝি বলল, "আপনারা যান। আপনি চিন্তা করবেন না। আমি বাচ্চাদের একেবারে বাসায় পৌঁছায়ে দেবো।"

জাহাঙ্গীর ভাই বললেন, "সেটা ঠিক। আমাদের মাঝি ভাই দায়িত্বশীল মানুষ, সে ঠিকই পৌঁছে দেবে।"

সাংবাদিক বলল, "তাহলে দেরি করে কাজ নেই। রওনা দিয়ে দেওয়া যাক।"

মাঝির একটা ছোট এসিস্টেন্ট ছিল দেখা গেল সেও ডাকাত দেখতে যেতে চায়। আমাদের মাঝি তাকেও চলে যেতে দিল। কিছুক্ষণের ভিতরে আমাদের ট্রলার খালি করে সবাই বড় ট্রলারে করে রওনা দিয়ে দিল। আমাদের ট্রলারে থাকলাম শুধু আমরা কয়জন আর আমাদের মুক্তিযোদ্ধা মাঝি। সত্যি কথা বলতে কী, যখন সবাই চলে গেল আর পুরো ট্রলারটা হয়ে গেল আমাদের তখন কেন জানি খুব মজা লাগতে লাগল। বিশাল হাওরের যেদিকে চাই সেদিকে পানি। পানির ভেতর দিয়ে বেশ দেখা যায়, নিচে গাছপালা ক্ষেত মাঠ সবকিছু ডুবে আছে। তার ভেতর দিয়ে আমাদের ট্রলারটা ভট ভট শব্দ করে যাচ্ছে। পুরো এলাকাটাতে যতদূর দেখা যায় কোথাও কিছু নেই। মাঝে মাঝে দেখা যায় অনেকদূর দিয়ে কোনো একটি নৌকা বা ট্রলার যাচ্ছে। ঘণ্টা দুয়েকের মাঝেই আমরা নদীর ঘাটে পৌঁছে যাব—আমাদের ইচ্ছে করছিল সেই দুই ঘণ্টা যেন খুব আস্তে আস্তে আসে। এত সুন্দর একটা জায়গা ছেড়ে আমাদের যেতেই ইচ্ছে করছিল না।

আমরা ট্রলারের ছাদে বসে গল্প করছি। মুক্তিযোদ্ধা মাঝি হাল ধরে বসে আছে তা না হলে তার সাথে গল্প করা যেত। মুক্তিযুদ্ধের গল্পগুলো একেবারে ফাটাফাটি গল্প হয়। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছি, আমি যখন বড় হবো তখন মুক্তিযুদ্ধের সবগুলো গল্প একত্র করে বিশাল একটা বই বানাব, সেটার নাম দিব, মুক্তিযুদ্ধের সত্যি গল্প!

সূর্য বেশ খানিকটা ঢলে পড়েছে মেঘের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় আবার ঢেকে যায়। তানিয়া কীভাবে জোর করে মানুষের উপকার করে বেড়ায় সেটাকে রংচং চড়িয়ে মাধুরী আমাদের একটা গল্প শোনালো, আমরা তখন হি হি করে হাসছি। হাসির মাঝেই রতন বলল, "ট্রলারের এই ভট ভট শব্দটা না থাকলে সবচেয়ে

ভালো হতো—"

রতনের কথাটা শেষ হবার আগেই হঠাৎ করে ট্রলারের ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপারটা এতই অবাক করা ব্যাপার যে আমরা আবার হি হি করে হেসে উঠলাম! আমাদের মুক্তিযোদ্ধা মাঝি কিন্তু হাসল না, ভুরু কুচকে ফেলল। সুমন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে চাচা?"

মাঝি মাথা নাড়ল, "বুঝতে পারলাম না। নিশনাটা তো ভালো ঠেকছে না।"

ইঞ্জিনটা বন্ধ তাই ট্রলারটা একেবারে নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে। এরকম নিঃশব্দে পুরো পথটা যেতে পারলে কী মজা হতো! মাঝি বলল, "তোমাদের কেউ একজন এসে হালটা একটু ধরো। আমি নিচে গিয়ে দেখি কী অবস্থা।"

আমরা প্রায় সবাই একসাথে লাফিয়ে উঠলাম হাল ধরার জন্যে—সুমন সবার আগে হাজির হলো বলে সেই হালটা ধরতে পারল। মাঝি বলল, "ডাইনে বামে ঘোরাবে না। সোজা ধরে রাখবা।"

সুমন বলল, "ঠিক আছে।"

মাঝি নিচে গিয়ে ট্রলারের ইঞ্জিনটা টানাটানি করে দেখতে থাকে। আমি বললাম, "কী হয়েছে চাচা?"

বুঝতে পারছি না, "ভাবছিলাম তেল শেষ হয়েছে। তেল তো আছে দেখি।"

"যদি এখন আর স্টার্ট না নেয় তাহলে কী হবে চাচা?"

"অন্য নৌকা-ট্রলার চলে আসবে সেইটা করে চলে যাব, চিন্তা করো না।"

যদিও আমার একটু চিন্তা লাগছিল, কিন্তু আমি বললাম, "না-না আমি চিন্তা করছি না।"

ট্রলারটা কিছুক্ষণ গিয়ে একসময় পুরোপুরি থেমে গেল। ট্রলারের মাঝে লোহার রড দিয়ে তৈরি একটা নোঙ্গর ছিল, মাঝি সেটা ফেলে দিয়ে ট্রলারটাকে থামিয়ে রেখে চিন্তিত মুখে ইঞ্জিনটাকে খোঁচাখুচি করতে লাগল।

আমরা ট্রলারের ছাদে বসে গল্প করতে লাগলাম। ধীরে ধীরে সূর্য ডুবে যাচ্ছে—ঠিক কী কারণ জানি না আমাদের বুকের মাঝে হঠাৎ একটা চাপা অশুভ ভয় এসে ভর করতে থাকে।

দেখতে দেখতে অন্ধকার নেমে আসে, চারিদিকে সুনসান নীরবতা, কোথাও কেউ নেই। বিশাল হাওরের মাঝখানে আমাদের ছোট ট্রলারটা পানিতে দুলছে। আমরা তার মাঝে চুপ করে বসে আছি। ঠিক এরকম সময় আমরা অনেকদূর থেকে একটা ট্রলারের ইঞ্জিনের চাপা শব্দ শুনতে পেলাম। মাধুরী বলল, "ঐ যে একটা ট্রলার আসছে।"

আমি নিচে গিয়ে মাঝিকে বললাম "চাচা একটা ট্রলারের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।"

মাঝি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, শুনছ নাকি? চল তাহলে এই ট্রলারটারে থামাই। আমার ইঞ্জিন এখন চালু হবে না।"

আমরা ওপরে উঠে এলাম। ট্রলারের ছাদে দাঁড়িয়ে মাঝি তার হাতের হ্যারিকেনটাকে দোলাতে লাগল।

কিছুক্ষণের ভেতরেই আমরা আবছাভাবে ট্রলারটাকে দেখতে পেলাম। অন্ধকারে সেটা সোজা আমাদের দিকে আসছে। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "এটা আমাদের ধাক্কা দিবে না তো?"

মাঝি মাথা নাড়ল, বলল, "নাহ্! ধাক্কা দিবে কেন? আমি এই আলোটা দেখাচ্ছি না? হাওরের মাঝখানে একটা ট্রলার থেমে আছে দেখেই বুঝতে পারবে।"

কিন্তু আমার ভেতরে কেমন জানি এক ধরনের অস্বস্তি কাজ করতে থাকে। কেন জানি মনে হতে থাকে ট্রলারটা আমাদের দেখেছে। দেখেই সোজা আমাদের দিকে আসছে আমাদের ধাক্কা দেবার জন্যে। আমি বললাম, "চাচা। ট্রলারটা তো এখন কাছে এসেছে। স্পিড কমাবে না? ইঞ্জিন বন্ধ করে না কেন? থামায় না কেন?"

মাঝি কোনো কথা বলল না, আমি বুঝতে পারলাম, হঠাৎ করে তার ভেতরে ভয় ঢুকেছে। দুই হাত মুখের কাছে নিয়ে চিৎকার করে বলল, "কে যায়?"

ট্রলার থেকে প্রায় সাথে সাথে কী একটা উত্তর ভেসে আসলো আমি ঠিক পরিষ্কার বুঝতে পারলাম না। মাঝি হঠাৎ করে আমার দিকে তাকাল, চাপা গলায় বলল, "হায় খোদা!"

"কী হয়েছে চাচা? এরা কারা?"

"বদি ডাকাত!" তারপর আমাদের দিকে ঘুরে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, "সাবধান! সবাই সাবধান!"

কীসের জন্যে সাবধান হবো আমরা কেউ বুঝতে পারি নি। কিন্তু কিছু বোঝার আগেই ট্রলারটা এসে আমাদের ট্রলারের মাঝামাঝি ধাক্কা দিল, ট্রলারটা সাথে সাথে ভয়ংকর একটা পাক খেয়ে ঘুরে গেল—আমরা যারা ছাদে দাঁড়িয়েছিলাম ছিটকে পড়ে গেলাম। কেউ ট্রলারের ছাদে, কেউ পানিতে। আমি অনেকগুলো আর্ত চিৎকার শুনতে পেলাম, কে করছে কেন করছে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আমি প্রায় শূন্যে উড়ে গিয়ে পানিতে পড়েছি। হাওরের পানিতে ডুবে যাবার আগে মনে হলো হা হা করে কেউ অট্টহাসি হাসছে! কে হাসে? কেন হাসে? এটাই কি বদি ডাকাত?

www.MurchOna.com

৮.

আমি একেবারে পানিতে তলিয়ে গেলাম, পানিতে ডুবতে ডুবতে একসময় পায়ের নিচে মাটি লেগে গেল, সেখানে পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে আমি ওপরে উঠে আসতে থাকি, মনে হয় বুঝি আর কোনোদিন ওপরে উঠতে পারব না। বাতাসের জন্যে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল বুঝি মরেই যাব, কিন্তু শেষপর্যন্ত ভুস করে আমি ভেসে উঠলাম, বদি ডাকাতের ট্রলারের ধাক্কা খেয়ে আমাদের ট্রলারটা এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে—আমি কালো পানির মাঝে ভাসছি, অনেক মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি শুনছি তার মাঝে আমি মাধুরীর গলাও শুনতে পেলাম, ভয় পেয়ে মনে হয় চিৎকার করছে।

ঠিক এরকম সময় আমার পাশেই কেউ ভুস করে ভেসে উঠে কাশতে থাকে। মনে হয় কাশতে কাশতে বুঝি মরেই যাবে। আমি সাঁতরে কাছে গিয়ে মানুষটাকে ধরলাম, মানুষটা ভয় পেয়ে চিৎকার করে বলল, "কে?"

"আমি। আমি লিটু।"

"ও তুই!" আমি মানুষটাকে চিনতে পারলাম, আমাদের তানিয়া।

তানিয়া পানিতে লুটোপুটি খেয়ে কাশতে কাশতে বলল, "তুই দেখেছিস কীভাবে ধাক্কা দিলো—আরেকটু হলে তো মরেই যেতাম—"

আমাদের ট্রলারের ওপর তখন বেশ কিছু মানুষ ছোটাছুটি করছে, চেঁচামেচি হইচই শুনতে পাচ্ছি। মাধুরী আমাদের ডাকাডাকি করছে, "লিটু তানিয়া সুমন তোরা কোথায়?"

সুমনের গলার স্বর শুনলাম, "এই যে এখানে—"

আমি তানিয়ার ঘাড় ধরে বললাম, "আয় আমরা ট্রলারের নিচে লুকিয়ে যাই।"

"কেন? লুকাবো কেন?"

"এটা বদি ডাকাতের ট্রলার—"

"বদি ডাকাত?"

"হ্যাঁ।"

"সর্বনাশ!"

"আয় তাড়াতাড়ি।" আমি আর তানিয়া ঠিক সময়মতো ট্রলারের নিচে লুকিয়ে গেলাম কারণ প্রায় সাথে সাথেই টর্চ লাইট পানিতে ফেলে ডাকাতগুলো আমাদের খুঁজতে শুরু করল। ট্রলারের নিচে লুকিয়ে থাকতে থাকতে আমি বললাম, "তুই কতক্ষণ থাকতে পারবি?"

"বেশিক্ষণ না। টায়ার্ড হয়ে গেছি।"

আমি বললাম, "তাহলে তুই বের হয়ে যা। এমনিতেই খুঁজে বের করে ফেলবে।"

"আর তুই?"

"আমি দেখি কী করতে পারি—"

"কী করবি?"

"এখনো জানি না—তুই উপরে গিয়ে ভান করবি যে তোরা পাঁচজনই এসেছিস—আমার কথা চেপে যাবি।"

"কিন্তু—"

আমি বললাম, "আর কিন্তু না। দেরি করিস না। তাড়াতাড়ি—"

আমি তানিয়াকে ঠেলে দিলাম, তানিয়া তখন ট্রলারের তলা থেকে বের হয়ে এলো, সাথে সাথে একজন ডাকাতের গলা শুনতে পেলাম, "এই যে একটা।"

"তোল। পানি থেকে তোল।"

একটা ডাকাত তানিয়াকে টেনে ট্রলারে তুলে ফেলল। আরেকটা ডাকাতের মোটা গলার স্বর শুনতে পেলাম, "সবগুলো কি পাওয়া গেছে?"

কেউ একজন বলল, "জানি না ওস্তাদ।"

মোটা গলার স্বর বলল, "এই ছেমড়া-ছেমড়ি তোরা কয়জন ছিলি?"

কেউ কোনো কথা বলল না। মোটা গলার স্বর তখন একটা ধমক দিল, "কয়জন ছিলি তোরা?"

রতন আর তানিয়া তখন একসাথে উত্তর দিল। রতন বলল ছয়জন, তানিয়া বলল চারজন। আমি বুঝতে পারলাম আমি ধরা পড়ে গেছি। রতন না বুঝে সত্যি কথা বলে দিয়েছে এখন আমাকে খুঁজে বের করে ফেলবে। মোটা গলার ডাকাতটা, সে নিশ্চয়ই সবার সর্দার—বদি ডাকাত একটা ধমক দিয়ে বলল, "চড়

www.MurchOna.com

মেরে দাঁত খুলে ফেলব। ঠিক করে বল কয়টা। একটা বলে ছয়জন আরেকটা বলে পাঁচজন! আসলে কয়জন।"

তানিয়া বলল, "আমরা পাঁচজন ছোট। আর বড় একজন। মাঝি চাচা। সব মিলিয়ে ছয়জন।"

আমি তানিয়ার বুদ্ধি দেখে চমৎকৃত হলাম! অন্যেরাও চুপচাপ আছে—তার মানে তারাও কিছু একটা আন্দাজ করেছে।

"মিছা কথা বলিস না তো?"

"না।"

"এই যে একটু আগে পানিতে পড়ে গেছে তাই তানিয়া আর লিটু বলে চিল্লাফাল্লা করল—কোনটা তানিয়া? কোনটা লিটু?"

তানিয়া বলল, "আমি তানিয়া।"

আমি শুনলাম সুমন বলল, "আমি লিটু।"

বদি ডাকাত বলল, "তুই পানিতে পড়লে এইরকম শুকনা থাকলি কেমন করে?"

"আমি পানিতে পড়ি নাই, ছাদটা ধরে ঝুলেছিলাম। অন্যরা ভাবছে পানিতে পড়েছি।"

"অ।" কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর শুনলাম মোটা গলা বলছে, "ঠিক আছে। তাহলে দেখ এই ট্রলারে নেবার মতো কী আছে।"

অন্য একজন বলল, "কিছু নাই ওস্তাদ। পোলাপানের স্কুলের একটা ব্যাগ আছে, আর কিছু নাই।"

"আর কিছু নাই?"

"না ওস্তাদ।"

ট্রলারে ডাকাতি করার মতো কিছু নাই শুনে বদি ডাকাত খুব রেগে উঠল, মুখ খারাপ করে বেশ কিছুক্ষণ সবাইকে গালি দিয়ে বলল, "চেহারা-ছুরত দেখে তো মনে হয় সব লাট সাহেবের বেটাবেটি। সাথে মাল-ছামান টাকা-পয়সা গয়নাপাতি কিছু নাই, ব্যাপারটা কী?"

কেউ কথার কোনো উত্তর দিলো না। এরকম সময় নাকি গলায় একজন বলল, "ওস্তাদ।"

"কী নাদের?"

"এই পোলাপানগুলারে দেখলে মনে হয় বড়লোকের বেটাবেটি।"

"হ। তাতে কী হইছে—খালি নামেই, বড়লোকের বেটাবেটি সাথে তো

www.MurchOna.com

টাকাপয়সা গয়নাপাতি কিছু নাই, ফকিরনীর অধম।"

"এক কাজ করলে কেমন হয় ওস্তাদ?"

"কী?"

"এদেরকে ধরে নিয়ে গেলে কেমন হয়? ছাড়ায়া নিতে দুইলাখ করে চাই। পাঁচজনে দশ লাখ।" কোনো পরিশ্রম নাই। নিট ইনকাম দশ লাখ।"

বদি ডাকাত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "বুদ্ধিটা খারাপ না কিন্তুক..."

"কিন্তুক কী?"

"ছেমড়া ছেমড়িদের রাখবি কই?"

"এত বড় হাওর—কোনো একজায়গায় লুকায়া রাখব।"

"আর টাকা-পয়সা? সেইটা নিবি কেমন করে?"

"তার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কেউ টাকা দিতে চাইলে কি আর নিতে ঝামেলা হয়।"

বদি ডাকাত হা হা করে হাসতে হাসতে বলল, "তা কথাটা তুই মন্দ বলিস নাই!"

"তাহলে কী করমু ওস্তাদ? সবগুলিরে নিমু?"

"নে। আগে বাঁধ। তারপর নে।"

ট্রলারের ভেতরে একটা হুটোপুটি শুরু হলো। তার মানে নিশ্চয়ই এখন সবাইকে বাঁধছে। কিছুক্ষণের ভেতরেই সবাইকে নিজেদের ট্রলারে তুলে নিয়ে যাবে। কাজেই আমাকে আগেই ডাকাতদের ট্রলারে উঠে যেতে হবে। কে জানে সেখানে লুকিয়ে থাকার কোনো জায়গা আছে কি না—না থাকলে খুব বিপদ হয়ে যাবে।

আমি আমাদের ট্রলারের তলা থেকে বের হয়ে কোনো রকম শব্দ না করে সাঁতরে ডাকাতদের ট্রলারটার নিচে গেলাম। তারপর খুব সাবধানে ট্রলারটা ধরে মাথাটা উঁচু করে একটু দেখলাম। ভেতরে কিছু বস্তা আর কিছু কার্টন রয়েছে। তার পিছনে মনে হয় গুটিশুটি মেরে থাকা যাবে। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম যখন মনে হলো কেউ নেই তখন সাবধানে ট্রলারে উঠে এক দৌড়ে বস্তাগুলোর পিছনে গিয়ে লুকিয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পেলাম সাদিব, সুমন, মাধুরী, তানিয়া আর রতনকে আনছে, সবার হাত পিছনে বাঁধা। সবার শেষে আনল মাঝিকে। তাকে দুইজন দুইদিক থেকে ধরে রেখেছে। আমি বস্তার পিছন থেকে দেখলাম সবাইকে এনে ইঞ্জিনের কাছে নিচে বসিয়ে দিল। আমি এখন ডাকাতগুলোকে দেখতে পেলাম,

www.MurchOna.com

যেটা সর্দার সেটা বেশি লম্বা-চওড়া না। গায়ের রং তামাটে, ভাঙা গাল আর বড় বড় গোঁফ। অন্য ডাকাতগুলো লম্বা-চওড়া, কেউ হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে আছে। দুইজনের কাছে বন্দুক, অন্যগুলোর হাতে লম্বা দা, মনে হয় এগুলোকেই কিরিচি বলে।

কিছুক্ষণের মাঝেই ট্রলারের ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল, আমি বস্তার পিছনে বসে টের পেলাম ট্রলারটা ঘুরে কোনো অজানার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে! আমার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড ধ্বক ধ্বক করে শব্দ করছে। আমরা কোথায় যাচ্ছি কে জানে, আমাদের কী হবে সেটাই-বা কে জানে!

যেখানে সবাইকে বেঁধে রেখেছে সেখানে সব সময়েই ডাকাতদের একজন দুজন বসে বিড়ি টানছে তাই আমি আমার বস্তার পিছন থেকে বের হবার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। আমি ধৈর্য ধরে সেখানে বসে রইলাম। তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে গিয়ে ধরা পড়ার কোনো মানে হয় না।

কিছুক্ষণ পর বদি ডাকাত নিচে নেমে এল, হাতে একটা বোতল, মনে হয় মদের বোতল, সেখান থেকে এক ঢোক খেয়ে একটা ঢেকুর তুলে বলল, "আমার অতিথিরা কেমুন আছে? ভালো? কুনো তকলিফ হচ্ছে নাকি?" তারপর খুব একটা মজা হয়েছে এরকম ভান করে হা হা হি হি করে হাসতে লাগল। শুধু যে একা হাসল তা না, অন্যগুলোও তার সাথে সাথে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে লাগল।

হাসির শব্দ থামার পর আমাদের মুক্তিযোদ্ধা মাঝি বলল, "কাজটা তোমরা ভালো করলা না।"

বদি ডাকাত একটু অবাক হয়ে বলল, "কোন কাজটা আমি ভালো করলাম না?"

"কয়টা বাচ্চা ছেলেমেয়েরে ধরে রওনা দিয়ে দিছ। মরদের বাচ্চারা এই রকম করে না।"

মাঝির কথা শুনে মোটা মতন একটা ডাকাত একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। হাতের বন্দুকটা নিয়ে সে মাঝির উপরে প্রায় ঝাপিয়ে পড়ছিল বদি ডাকাত হাত তুলে থামাল, বলল, "তাহলে তোমার ধারণা কামটা মরদের মতো হয় নাই?"

"না।"

"কোন কামটা মরদের মতো হইত?"

"বাচ্চাগুলোরে ছেড়ে দাও—তারপর যা খুশি করো।"

বদি ডাকাত ট্রলারের জানালার কাছে বেঞ্চে পা ছড়িয়ে বসে বলল, "তাই

www.MurchOna.com

তো করতে গিয়েছিলাম। গ্রামের মানুষ খবর পেয়ে যা ঝামেলা পাকাইছে জান নিয়ে পালাতে পারি না।"

মোটা মতন একটা ডাকাত বলল, "খলীল আর কুদ্দুসরে ধইরা রাখছে। যা একটা মাইর দিছে সেইটা আর বলার মতো না।" তারপর খুব আনন্দ হচ্ছে এরকম ভঙ্গি করে হাসতে লাগল।

আমি বস্তার পিছনে অবাক হয়ে বসে রইলাম, নিজের দলের দুজন ধরা পড়ে পিটুনি খাচ্ছে তার মাঝে আনন্দের কী আছে?

বদি ডাকাত পা দিয়ে মাঝিকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "আমি পোলাপান নিয়া কাম করি না। কিন্তুক বিজনেস খুব খারাপ। বন্যাটা আইসা খুব সমস্যা। কারো কাছে টাকা-পয়সা নাই। চাইরটা ডাকাতি কইরা একটার মাঝে কিছু টাকা-পয়সা পাওয়া যায়—এতগুলো মানুষ নিয়া থাকি, সবার দায়-দায়িত্ব আমার। বুঝছ?"

মাঝি কিছু বলল না।

বদি ডাকাত আবার বিড় বিড় করে কথা বলতে লাগল, "আমাদের বিজনেসে কোনো নিয়ম-কানুন নাই। যেই লাইনে কাম করলে টাকা আসে সেইটাই নিয়ম। সেইটাই বিজনেস। এই পোলাপানের একটা করে আংগুল কেটে তাদের বাপের কাছে পাঠালে যদি টাকা আসে তাহলে সেইটাই বিজনেস। বুঝছ?"

মাঝি এবারেও কোনো কথা বলল না। বদি ডাকাত বলল, "তয় তোমারে একটা কথা বলে রাখি। ভবিষ্যতে কোনো দিন বদি ডাকাতের মুখে মুখে কথা বলবা না। এখন পর্যন্ত কেউ সেই সাহস দেখায় নাই। বুঝছ?"

মাঝি এবারেও কোনো কথা বলল না। তখন কালো মতন একটা ডাকাত বলল, "ওস্তাদ। এই পোলাপানের নাম-ঠিকানা দরকার। বাপের নাম জানা দরকার—তা না হলে খবরটা দিব কেমন করে?"

বদি ডাকাত বলল, "কথা ঠিকই বলছস। নে জিজ্ঞেস কর।"

কালো মতন ডাকাতটা বলল, "কিন্তুক ওস্তাদ নাম-ঠিকানাটা আমরা লিখমু কুথায়। কাগজ-কলম তো নাই।"

"নাই? কোথাও নাই?"

"জে না। আরো একটা সমস্যা আছে।"

"কী সমস্যা?"

"আমরা কেউ তো লেখাপড়া জানি না। কাগজে লিখমু কেমন করে?"

সবগুলো ডাকাত তখন হা হা করে হাসতে লাগল। লেখাপড়া না জানা যে

www.MurchOna.com

এত আনন্দের ব্যাপার আমি সেটা আগে জানতাম না। বদি ডাকাত কালো মতন ডাকাতটার ঘাড়ে একটা থাবা দিয়ে বলল, "বেকুবের বাচ্চা বেকুব! আগে তুই স্কুলে ভর্তি হ। লেখাপড়া শিখ তারপর পোলাপানের নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিস।"

ডাকাতগুলো কিছুক্ষণ আবোলতাবোল কথা বলল তারপর ট্রলারের ছাদে চলে গেল। বদি ডাকাত যেতে যেতে বলল, "এখন থাকুক, আগে জায়গা মতন পৌঁছাই তারপরে দেখা যাবে।"

যখন ট্রলারের নিচে আর কেউ নাই তখন আমি খুব সাবধানে বস্তার পিছন থেকে বের হয়ে এলাম। আমাকে দেখে সবাই বিস্ময়ের এক ধরনের শব্দ করতে গিয়ে থেমে গেল—করলেও খুব একটা সমস্যা ছিল না, ইঞ্জিনের প্রচণ্ড ভট ভট শব্দে কিছু শোনার উপায় নেই। আমি গুড়ি মেরে কাছে এগিয়ে গেলাম। কাছে যেতেই মাঝি বলল, "লিটু তাড়াতাড়ি আমার হাতটা খুলে দাও।"

আমি হাত খোলার চেষ্টা করলাম, লাইলনের দড়ি দিয়ে বেঁধেছে খুব শক্ত করে। আমার খুলতে বেশ কষ্ট হলো। একটু ঢিলে করার সাথে সাথে মাঝি তার হাত দুটো দড়ির বাঁধন থেকে বের করে নিল। তারপর আমি আর মাঝি মিলে অন্যদের হাত খুলতে শুরু করলাম, আরো একজনের হাত খুলতেই সে আরেকজনের হাত খুলে দিল—কিছুক্ষণের মাঝেই সবার বাঁধন খুলে দেয়া হলো। যখন সবাই লাল হয়ে থাকা হাতের কবজিতে হাত বুলাচ্ছে ঠিক তখন আমি একজনের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম, কেউ একজন নিচে আসছে। আমি ছুটে বস্তার আড়ালে লুকিয়ে যেতে চেষ্টা করছিলাম কিন্তু ততক্ষণে খুব দেরি হয়ে গেছে। সবাই তাদের হাত পিছনে নিয়ে দড়ি বাঁধা অবস্থার মতো ভান করে রইল—আমিও সেভাবে পড়ে রইলাম।

ডাকাতটা কাছাকাছি এসে আমাদের এক নজর দেখল। আমার বুক ধ্বক ধ্বক করছে—আমি প্রায় নিশ্চিত ছিলাম যে আমাকে দেখেই চিৎকার করে উঠবে, "তুই কে? কোথা থেকে এসেছিস?" কিন্তু সেরকম কিছু হলো না, আমরা এতজন মানুষ গাদাগাদি করে পড়ে আছি—তার মাঝে একজন যে বেড়ে গেছে এই মাথা মোটা ডাকাতটা ধরতেই পারে নি।

ডাকাতটা আমাদের এক নজর দেখে পা ছড়িয়ে বসল। বন্দুকটা দুই পায়ের মাঝখানে রেখে সে একটা বিড়ি ধরিয়ে গুন গুন করে গান গাইতে লাগল। গলায় কোনো সুর নেই, গানের কথারও কোনো মাথা-মুণ্ডু নেই—কিন্তু ডাকাতটার সেটা নিয়ে কোনো মাথা ব্যাথা নেই।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

মাঝি ফিসফিস করে বলল, "তোমরা চুপচাপ বসে থাকো। আমি এই ডাকাতটার বন্দুকটা কেড়ে নেই।"

"তারপর কী হবে?"

"হাতে একটা বন্দুক থাকলে দেখি ডাকাতের বাচ্চা ডাকাতেরা কী করে!"

আমি ফিসফিস করে বললাম, "কোনো শব্দ না করে ধরে ফেলি?"

"কীভাবে?"

"যখন একটু অন্যমনস্ক হবে তখন সবাই ঝাপিয়ে পড়ব। আপনি মুখ চেপে ধরবেন—যেন শব্দ করতে না পারে!"

মাঝি কিছু একটা ভাবল, তারপর বলল "ঠিক আছে।"

আমরা অপেক্ষা করতে থাকি। কিছুক্ষণ পর ডাকাতটার গান থেমে আসে, চোখ বন্ধ হয়ে আসে, মনে হয় ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে! মাঝি ফিসফিস করে বলল, "একজন টান মেরে বন্দুকটা নিবে—ঠিক আছে?"

মাধুরী বলল, "আমি নিব।"

"অন্যেরা চেপে ধরবে, আমি মুখটা চেপে ধরব। তারপর গামছা দিয়ে বেঁধে দিব যেন শব্দ করতে না পারে।"

আমরা মাথা নাড়লাম, বললাম, "ঠিক আছে।"

নিঃশব্দে আমরা উঠে দাঁড়াই, পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম, ডাকাতটা কিছু বোঝার আগে মাঝি তাকে নিচে ফেলে চেপে ধরেছেন। মুখের মাঝে গামছাটা পুরে দিয়ে শক্ত করে চেপে রাখলেন আমরা তাড়াতাড়ি তার হাত বেঁধে ফেললাম। মাধুরী ততক্ষণে বন্দুকটা টেনে সরিয়ে নিয়েছে। কত তাড়াতাড়ি ডাকাতটাকে ধরে ফেলেছি সেটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "চাচা, এই ডাকাতটাকে এখন কী করব?"

"এর শার্টটা খুলো। খুলে আমাকে দাও।"

"শার্ট দিয়ে কী করবেন চাচা?"

"পরব। পরে উপরে যাব। অন্ধকারে আমাকে চিনতে পারবে না!"

আমরা সবাই চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, "উপরে উঠে কী করবেন চাচা?"

"দেখি। কী করা যায়।"

ডাকাতের হাত আচ্ছা মতন বেঁধে রেখেছি তাই শার্টটা খুলে আনা গেল না, ছিড়ে আনা লাগল। মাঝি চাচা সেভাবেই শার্টটা পরে নিলেন, আবছা অন্ধকার তাই উপরে গেলে কেউ সন্দেহ করবে বলে মনে হয় না।

মাঝি চাচা বললেন, "তোমরা নিচে বসে থাক। কোনো একটা কিছু শক্ত করে

www.MurchOna.com

ধরে রেখো।"

"কেন চাচা?"

"আমি ট্রলারটাকে পাক খাওয়াব।"

"কিন্তু চাচা—"

"কোনো কিন্তু নাই। ভয় পাবা না। আমি আছি।"

"আপনার যদি কিছু হয়?"

"হবে না। আল্লাহ্ ভরসা। পাকিস্তান আর্মি পারে নাই। রাজাকার পারে নাই। দালালেরা পারে নাই। জামাতীরা পারে নাই। এরাও পারবে না।"

আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম। মাঝি চাচা বন্দুকটা হাতে ধরে উপরে উঠে গেলেন। আমরা ট্রলারের ছাদে তার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হলো হেঁটে হেঁটে পিছনে যাচ্ছেন, যেখানে একজন হাল ধরে রেখে ট্রলারটা চালিয়ে নিচ্ছে। আমাদের বুক ধ্বক ধ্বক করছে, আজ সকালে যখন আমরা বের হয়েছিলাম তখন কি একবারও কল্পনা করেছিলাম এরকম কিছু একটা ঘটবে?

হঠাৎ করে আমরা একটা মানুষের চিৎকার শুনতে পেলাম সাথে সাথে ঝপাং করে একটা শব্দ, কেউ একজন পানিতে পড়ে গেছে। কে পড়েছে কেন পড়েছে বোঝার আগেই হঠাৎ করে ট্রলারটা খুব জোরে ডান দিকে ঘুরে গেল, সাথে সাথে ট্রলারের ছাদ থেকে তিন-চারজন ডাকাত চিৎকার করতে করতে গড়িয়ে পানিতে পরে গেল।

ট্রলারের ইঞ্জিন বিকট স্বরে গর্জন করে ওঠে এবং হঠাৎ করে সেটা বাম দিকে ঘুরে গেল, ঝপাং-ঝপাং করে তখন আরো দুজন পানিতে পড়ে গেল! আমরা নিজেরাও ট্রলারের ভেতরে একবার ডান থেকে বামে আরেকবার বাম থেকে ডানে গড়িয়ে গেলাম। কোনোমতে উঠে দেখি একজন ডাকাত ছাদ থেকে গড়িয়ে পড়তে গিয়ে কোনোভাবে ছাদটা ধরে ঝুলে আছে, জানালায় পা দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

আমি চিৎকার করে বললাম, "ধাক্কা দে! ধাক্কা দে—"

সবাই উঠে ডাকাতটাকে ধাক্কা দিতেই মানুষটা ছিটকে পানিতে পড়ে গেল। ট্রলারটা গর্জন করে তাকে ফেলে সামনে ছুটে যায়।

উপরে একটা হুটোপুটি দৌড়াদৌড়ির শব্দ শুনতে পেলাম, তারপর হঠাৎ কেমন যেন সবকিছু শান্ত হয়ে গেল। ট্রলারের ছাদে কী হচ্ছে আমরা তার কিছুই বুঝতে পারছি না। অনেকগুলো ডাকাত গড়িয়ে পড়েছে, আমরাও ধাক্কা মেরে একটাকে ফেলে দিয়েছি—কিন্তু সত্যি সত্যি কী সব ডাকাতকে পানিতে ফেলে

www.MurchOna.com

দেয়া গেছে? নাকি এখনো কোনো কোনো ডাকাত রয়ে গেছে?

ঠিক এরকম সময়ে আমরা মাঝি চাচার গলা শুনলাম, "তোমরা আস উপরে। সব ডাকাত এখন হাওরের পানিতে।"

আমরা আনন্দে চিৎকার করে হুটোপুটি করে ট্রলারের ছাদে হাজির হলাম! আসলেই সেখানে কোনো ডাকাত নেই। মাঝি চাচা এক হাতে আলগোছে বন্দুকটা ধরে রেখে অন্য হাতে হাল ধরে রেখেছেন। চারিদিকে থই থই পানি, মাঝেমধ্যে দুই-একটি গাছ। জোছনার আলোতে পুরো এলাকাটাকে মনে হচ্ছে বুঝি কোনো অলৌকিক দৃশ্য।

মাঝি চাচা বললেন, "তোমরা সাথে না থাকলে আজকে আমি সবকয়টারে শেষ করতাম!"

সুমন বলল, "আপনি তো শেষ করেছেনই! হাওরে ফেলে দিয়েছেন!"

"আরে না। এরা হাওরের মানুষ—পানিতে মাছের মতো সাঁতার কাটে। এদের কিছু হবে না।"

"একটাকে তো ধরেছি। দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি।"

মাঝি চাচা বললেন, "আসলটাকে ধরতে চাচ্ছিলাম। বদি ডাকাত—অসম্ভব খারাপ মানুষ। এমন কাজ নাই সে করে নাই। বুকের ভিতরে কোনো মায়া-দয়া নাই।"

তানিয়া বলল, "থাকুক। আমাদের যে কোনো বিপদ হয় নাই, সবাই যে সুস্থ আছি সেটাই বড় কথা।"

মাধুরী জিজ্ঞেস করল, "এখন আমরা কি বাসায় যাব?"

"হ্যাঁ।" মাঝি চাচা মাথা নাড়লেন, "আমরা এখন শহরে যাচ্ছি। ট্রলারটা ঘুরিয়ে নিচ্ছি।"

"ডাকাতগুলো আবার ট্রলারে উঠে পড়বে না তো?"

মাঝি চাচা হাসলেন, বললেন, "না। উঠবে না।" তারপর আমাকে ডেকে বললেন, "তুমি একটু হালটা ধরো। আমি নিচে গিয়ে অন্য ডাকাতটারে একটু দেখে আসি, ডাকাতটা ছুটে গেলে বিপদ হবে।"

আমি হালটা ধরলাম, এমনি ধরে রাখতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু হালটা ডানে বাঁয়ে নাড়াতে বেশ শক্তি লাগে। মাঝি চাচার গায়ে নিশ্চয়ই অনেক জোর তা না হলে এত বড় ট্রলারটাকে কেমন করে এত তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে দিলেন?

মাঝি চাচা বন্দুকটা ছাদে রেখে নিচে নামছিলেন হঠাৎ ট্রলারের এক পাশ থেকে লাফ দিয়ে কে যেন উঠে এসে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিল। আমরা আতংকে চিৎকার করে উঠলাম। অন্ধকারে মানুষটাকে ভালো দেখা যায় না তবু আমরা

www.MurchOna.com

তাকে চিনতে পেলাম। মানুষটা বদি ডাকাত। সারা শরীর ভিজে চক চক করছে, কোমরে বাঁধা গামছা দিয়ে মুখ মুছে বন্দুকটা মাঝি চাচার মাথায় ধরে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "তোরে আমি খুন করে ফেলব।"

আমরা হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, মনে হলো আমাদের এতটুকু নড়ার ক্ষমতা নেই।

বদি ডাকাত আবার হুংকার দিয়ে মাঝি চাচাকে বলল, "তোর এত বড় সাহস? আমার ট্রলারে উঠে আমার মানুষদের তুই হাওরের মাঝে ফেলিস?"

বদি ডাকাত উঠে দাঁড়িয়েছে বন্দুকটা তাক করেছে মাঝি চাচার মাথার দিকে। মনে হচ্ছে সে আসলেই গুলি করে দেবে। জোছনার আলোতে পুরো দৃশ্যটা এত অদ্ভুত যে আমার মনে হতে থাকে এটা আসলে ঘটছে না। এটা বুঝি কোনো একটি দুঃস্বপ্নের দৃশ্য। আমার মনে হয় আমি চোখ খুলে তাকাব আর সাথে সাথে সব বুঝি মিলিয়ে যাবে।

বদি ডাকাত আবার চিৎকার করে বলল, "ভেবেছিস আমাকে হাওরে ফেলে দিলেই আমি আর হিসাবের মাঝে নাই? তুই তাহলে বদি ডাকাতইকে চিনিস নাই! পানিতে ফেলে কিংবা আগুনে ফেলে বদি ডাকাইতকে কেউ থামাতে পারে নাই। তুইও পারবি না!"

কিছু একটা করতে হবে মাঝি চাচাকে বাঁচানোর জন্যে—হাতে সময় নেই। আমরা সবাই গিয়ে কি ঝাপিয়ে পড়ব বদি ডাকাতের ওপর? পারব কি ওকে কাবু করতে?

হঠাৎ আমার চোখে পড়ল দূরে একটা গাছ। গাছের ডাল নিচু হয়ে বের হয়ে আছে। ট্রলারটা যদি সেদিকে নিয়ে যাই, গাছের ডালের ধাক্কায় ছিটকে পড়বে বদি ডাকাত! সে তাকিয়ে আছে উল্টো দিকে, দেখবে না গাছটাকে!

আমি খুব ধীরে ধীরে ট্রলারটাকে ঘোরাতে শুরু করলাম। বদি ডাকাত টের পাচ্ছে না যে ট্রলারটা ঘুরে যাচ্ছে। সে জানে না সামনে একটা গাছের ডাল, আর একটু হলেই সেই ডালে আঘাত খেয়ে ছিটকে পড়বে বদি ডাকাত।

বদি ডাকাত মুখ বিকৃত করে বলল, "কলমা পড় শালা হারামির বাচ্চা! বদি ডাকাতের সাথে লাগতে আসে আহাম্মকেরা..."

আর একটু—তাহলেই গাছের ডালে ধাক্কা খাবে বদি ডাকাত। কিন্তু মনে হচ্ছে সেই সময়টাও নাই! কী করা যায় আমি বুঝতে পারলাম না। প্রায় না ভেবেই আমি চিৎকার করে ডাকলাম, "এই বদি ডাকাত!"

বদি ডাকাত চমকে আমার দিকে তাকাল, মনে হয় সে বিশ্বাস করতে পারছে

www.MurchOna.com

না যে আমার মতো ছোট একজন মানুষ তাকে এভাবে ডাকতে পারে। আমি চিৎকার করে বললাম, "তোমার শরম করে না, লজ্জা করে না?"

বদি ডাকাত ভ্যাবাচেকা খেয়ে বলল, "শরম? লজ্জা?"

"হ্যাঁ। মানুষ হয়ে মানুষের ওপর অত্যাচার করো?"

আমার কথা শেষ হবার আগেই ট্রলারটা প্রায় গাছের ডালের নিচে চলে এসেছে, বদি ডাকাত প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ করে গাছের ডালের প্রচণ্ড আঘাতে বদি ডাকাত ছিটকে উপরে উঠে ধরাম করে পড়ে গেল। বন্দুকটা প্রায় উড়ে যাচ্ছিল মাধুরী খপ করে সেটা ধরে ফেলল। আমরা সবাই গাছের ডালটাকে দেখছিলাম, মাথা নিচু করে সেটাকে মাথার উপর দিয়ে চলে যেতে দিচ্ছিলাম—কিন্তু সম্ভব হলো না, গাছের ডালে প্রচণ্ড শব্দে ধাক্কা খেয়ে ট্রলারের হালটা মড়াত করে ভেঙে গেল—আমি ছিটকে প্রায় উড়ে গিয়ে পানিতে পড়লাম। আজকে রাতের মাঝে দ্বিতীয়বার।

পানির নিচে ডুবে যেতে যেতে আমি শুনতে পেলাম ট্রলারের ছাদে সবাই চিৎকার করছে! চিৎকারটি আনন্দে না ভয়ে বোঝা গেল না!

ট্রলারটা অনেক দূরে চলে গিয়েছে, অনেকক্ষণ পর ইঞ্জিনটা বন্ধ করা হলো, তারপর ভাঙা হাল দিয়ে অনেক কষ্টে সেটা আমার দিকে ঘুরে আসতে লাগল। আমি সাঁতরে ট্রলারটার কাছে যেতে থাকি। সবাই ট্রলারের পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে খুঁজছে। আমি চিৎকার করে হাত নাড়তেই সবার আনন্দের ধ্বনি শুনতে পেলাম।

আমাকে মাঝি চাচা টেনে নৌকার উপরে তুলল। পিঠে থাবা দিয়ে বলল, "তুমি আজকে আমার জানটা বাঁচিয়েছ! যদি গাছের ডালে বাধিয়ে না দিতে আমারে কেউ বাঁচাতে পারত না!"

আমি একটু হাসার চেষ্টা করলাম। মাঝি বলল, "কথা বলে একটু সময় নিয়েছ, এই সময়টা না নিলেই আমি আর বেঁচে থাকি না।"

সাদিব বলল, "লিটুর বুদ্ধি অসাধারণ!"

মাধুরী বলল, "অসাধারণ আর ফ্যান্টাস্টিক।"

তানিয়া বলল, "আজ থেকে তুই আর লি-টু না তুই হলি লি-ওয়ান।"

রতন শ্লোগান দেওয়ার মতো করে বলল, "আমার ভাই তোমার ভাই!"

সবাই চিৎকার করে বলল, "লি-ওয়ান ভাই! লি-ওয়ান ভাই!"

শুধু বদি ডাকাত কিছু বলল না। দড়ি বাঁধা অবস্থায় চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকালো।

www.MurchOna.com

৯.

এই হলো আমার বৃত্তান্ত! প্রথম যেদিন আব্বু এখানে বদলী হওয়ার কথা বলেছিলেন তখন আমার এত মন খারাপ হয়েছিল যে বলার মতো নয়! এখন সেটার কথা মনে পড়লে হাসি পায়। এখন এখানে আমার কত বন্ধু-বান্ধব। আধা পাগল রতন, আর তার কল্পনার মজার একটা পৃথিবী। হাওরের পানিতে বদি ডাকাতের হাতে আমাদের ধরা পড়া আর সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার কাহিনীটা রতনের মুখ থেকে না শুনলে একজনের জীবন বৃথা। হাত পা নাড়িয়ে চোখ বড় বড় করে সে গল্পটা করে। প্রত্যেকবার গল্পটা করার সময় সে তার সাথে আরো নূতন কিছু জুড়ে দেয়। ডালপালা গজিয়ে সেই গল্প এখন এত বড় হয়েছে যে এটা প্রায় আরব্যরজনীর গল্পের মতো হয়ে গেছে।

রতন ছাড়াও আমাদের ক্লাশে আছে ভালো ছাত্র সাদিব আর গাট্টাগোট্টা সুমন। সাদিবের মতন এমন নিখুত ভালো ছাত্র পৃথিবীতে আর একটি আছে কি না আমার সন্দেহ আছে। পৃথিবীর সবকিছু তার জানতে আগ্রহ ক্লাশের বইগুলো মনে হয় ক্লাশ শুরুর এক সপ্তাহের মাঝে শেষ করে ফেলে! এত ভালো ছাত্র হয়েও সে মোটে অহংকারী নয়, ঘর কুনোও নয়। আমাদের সাথে দৌড়াদৌড়ি করে মাঠে ক্রিকেট খেলে। গল্প বইয়ের পোকা, আর শুধু জ্ঞানের বই নয় ডিটেকটিভ, সায়েন্স ফিকশন এমনকী আমাদের মতন লুকিয়ে লুকিয়ে রোমান্টিক উপন্যাসও পড়ে! সুমনও আছে আমাদের সাথে—প্রতিদিন সকালে উঠে সে ব্যায়াম করে, আমাদের ক্রিকেট টিমের উইকেট কিপার আর ফুটবলের হাফ ব্যাক। গায়ে বেশি জোর থাকলে মানুষের মেজাজ একটু গরম হয়, সুমনেরও একটু মেজাজ গরম তার সাথে কোনো ধানাইপানাই নেই।

মাধুরী আর তানিয়াও আছে। মাধুরীর গলা মনে হয় আস্তে আস্তে আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে। আগে আমার মনে হতো রবীন্দ্র সঙ্গীত বুঝি বুড়ো মানুষদের গান।

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

হাওরে আমরা যে রাতে বদি ডাকাতের হাতে ধরা পড়েছিলাম সে রাতে সবকিছু শেষ করে আমরা যখন ফিরে আসছি তখন মাধুরী আমাদের কয়টা গান শুনিয়েছিল। একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনিয়েছিল যার প্রথম লাইনটা হচ্ছে "সখী ভাবনা কাহারে বলে..." আহা! গানটা শুনে আমার ভেতরে সব ওলটপালট হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের মতন ওরকম একটা বুড়ো মানুষ এত সুন্দর গান লিখল কেমন করে?

আর তানিয়া? তার দেখাদেখি মানুষের উপকার করার রোগ এখন সবার মাঝে সংক্রামিত হয়ে গেছে! তানিয়ার দেখা দেখি এখন সবাই অন্যের উপকার করে। তানিয়া আমাদের শিখিয়েছে দশজনকে বলে হইচই করে করলে হবে না, করতে হবে গোপনে যেন কেউ না জানে। আমরা তো আর তানিয়ার মতো মাদার টেনিয়া হয়ে যাই নাই তাই আমরা এত গোপন রাখতে পারি না। ছোটখাটো উপকার করলেও সেটা বড় গলায় দশজনকে বলে ফেলি! মাদার টেনিয়া হওয়া কি সোজা ব্যাপার নাকি! সবাই কি আর মাদার টেনিয়া হতে পারে?

ক্লাশে আমাদের আরো কত বন্ধু—সবার কথা কি বলে শেষ করা যাবে? সারাদিন হৈচৈ ছোটাছুটি করে রাতে যখন ঘুমাতে যাই তখন মনে হয়, আহা! বেঁচে থাকাটা কী মজার!

❑

suman_ahm@yahoo.com
www.MurchOna.com

জন্ম : ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচ.ডি. করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করেন সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে।

তাঁর স্ত্রী ড. ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।

Litu Brittanto by Md. Jafar Iqbal

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com